

আঁথি জলের রাজপুরী

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী



বাংলা পিডিএফ এর জন্য ভিজিট করুন

[*boierpathshala.blogspot.com*](http://boierpathshala.blogspot.com)

boidownload.com

boidownload24.blogspot.com

Facebook.com/bnebookspdf

facebook.com/groups/bnebookspdf

♥♥বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনুন।♥♥

আমরা কোন পিডিএফ তৈরি বা সংরক্ষণ করি না,
শুধু ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা পিডিএফ শেয়ার করি।

Email: jirogrability@gmail.com



উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

নির্মল বুক এজেন্সী



প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ, ১৩৮০

প্রকাশক
এন. সাহা
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭

ছবি এঁকেছেন
শৈল চক্রবর্তী

সম্পাদনা
বিশ্বনাথ দে

মুদ্রক
অজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিটিং ওয়ার্কস্
১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ব্লক ও প্রচ্ছদ-মুদ্রণ
হাশনাল হাফটোন কোম্পানী
৬৮, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান
নির্মল পুস্তকালয়
১৮ বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

তিন টাকা



যে সব গল্প আছে



অথৈ জলের রাজপুরী ১

পাকা ফলার ১০

পাজি পিটার ১৮

ছোটো ভাই ২৫

ফুলপরী ৩১

ভালা আর বুয়া ৩৪

তারপর ৪০

জাহাজের কাগজের ফানুস



সেই যে দেশের মেয়েদের খুকির মতন ছোট ছোট পা হয়, আর ছেলেরা মাস্টারের দিকে পিছন ফিরে পড়া বলে, যে দেশের লোকেরা বাঁকা চোখে মিটমিট করে তাকায় আর কাঠি দিয়ে ভাত আর আরগুলার চাটনি খেয়ে সেই কাগজের ফানুসগুলো বানায়,—সেই চীন দেশে চাঙের বাড়ি ছিল।

চাঙের বাপ ছিল দোকানদার। সে তার দোকানে বসে লাল লাল ফানুস আর রেশমি পাখা বেচত। চাঙ ছোট ছেলেমানুষ, সে তার পুঁথি বগলে করে পাঠশালা পড়তে যেত। সে দেশের অক্ষরগুলো দেখতে জাহাজের মত। চাঙ পাতলা কাগজের উপর সরু তুলি দিয়ে সেইরকম অক্ষরে চমৎকার কবিতা লিখত। তার গুরুমশাইরা সেই কবিতা পড়ে ভারি আশ্চর্য হয়ে যেতেন, তেমন কবিতা আর কেউ কখনো লেখেনি।

দেখতে দেখতে চাঙ বড় হল, তার পাঠশালার পড়া শেষ হয়ে গেল।

তখন চাঙ-এর বাপ বলল, ‘লেখাপড়া তো হয়েছে, এখন দোকানে এসে কাজ কর।’

চাঙ বলল, ‘বাবা, দোকানের কাজ আমার একটুও ভাল লাগে না। আমাকে বিদেশে যেতে দাও, আমি করে খাব।’

চাঙের বাপ বলল, ‘তাও কি হয়?’

চাঙ আর কিছু বলল না, কিন্তু তার মন বড় খারাপ হয়ে গেল। সে পেট ভরে খায় না, হেসে কথা কয় না, আর খালি জিনিস বেচে তার দাম নিতে ভুলে যায়। কাজেই তার

বাপ আর কী করে? সে বলল, 'আচ্ছা বাবা, তোর যেখানে ভাল লাগে সেখানে যা!'

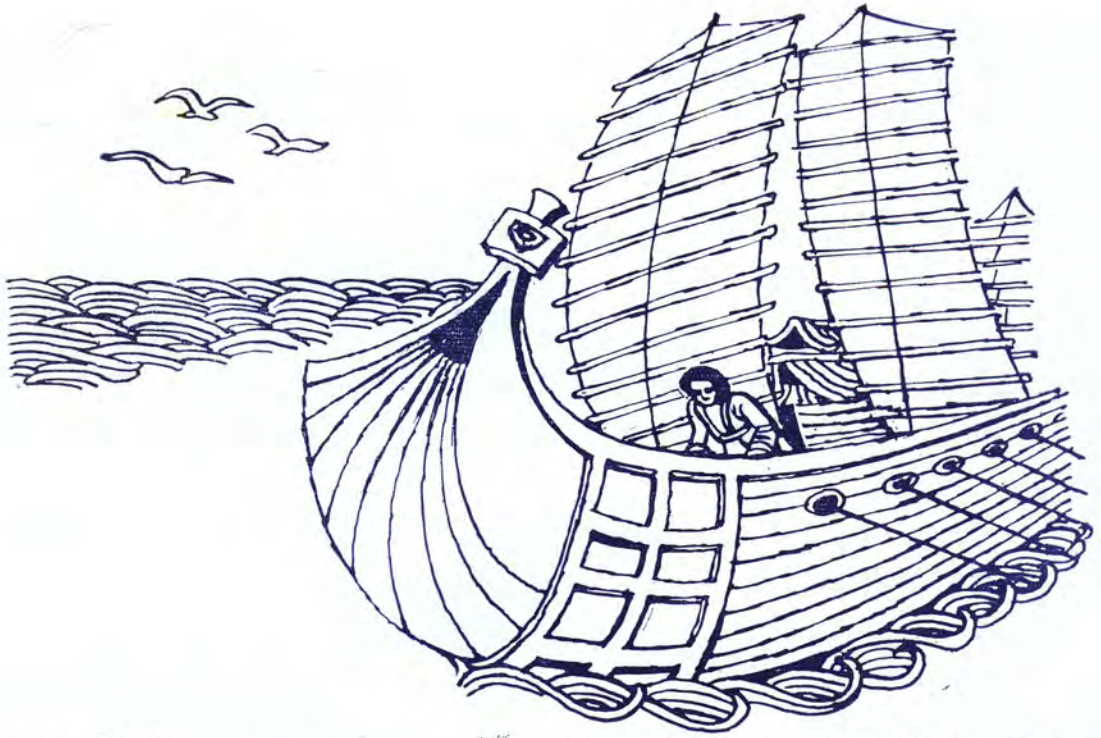


চাঙ অমনি তিন হাত উঁচু এক লাফ দিলে আর দু-হাতে করে তার বাপের পায়ের ধুলো নিল। সেইদিনই সে তার মা-বাপের কাছে বিদায় নিয়ে, তার ছোট্ট পুঁটুলিটি বগলে করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। তারপর গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে বন্দরে, এমনি করে সে সমুদ্রের ধারে এসে দেখল যে বড় বড় জাহাজ সব বাঁধা রয়েছে, তারা পাল খাটিয়ে, সমুদ্র পার হয়ে পৃথিবীর নানান জায়গায় যাবে।

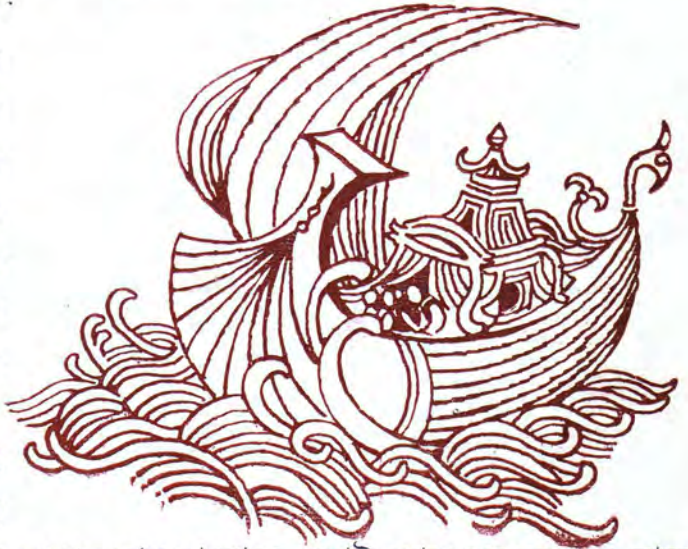
চাঙ বলল, 'বাঃ! এর একটা জাহাজে চড়ে গেলে কী মজাই হবে!'

তখনই সে একটা জাহাজের মাঝিকে গিয়ে বলল, 'মাল্লা চাই? আমি মাল্লার কাজ করতে এসেছি।'

সেই জাহাজের মাল্লা হয়ে সে তো সমুদ্রে চলল, কিন্তু সে যেমন মজা হবে মনে করেছিল তার কিছুই হল না। খানিক দূর গিয়েই সেই জাহাজ ঢেউ খেয়ে ছলতে লাগল। আর তখন চাঙ ভাবল বুঝি তার নাড়িভূঁড়ি সব বমি হয়ে যাবে! তারপরে যেই সে একটু সামলে নিয়েছে, অমনি এমন ঝড় এল যে, ঝড় যাকে বলে! ঢেউয়ের ঘাড়ে ঢেউ চড়ে পাহাড়ের মতন উঁচু হয়ে এসে সেই জাহাজের উপর ভেঙে পড়তে লাগল। দেখতে দেখতে



জাহাজখানি গুঁড়ো হয়ে মাঝি মাঝী সব কে কোথায় গেল, চাও তার কিছুই বুঝতে পারল না। সে খালি দেখতে পেল যে জাহাজের মাস্তুলটা তার কাছ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। সে প্রাণপণ করে সেটাকে আঁকড়ে ধরে রইল। তারপর বাড়ি থেমে গেলে সে দেখল যে মাস্তুলটা তাকে নিয়ে ভাসতে ভাসতে এসে ডাঙায় ঠেকেছে। সেইখানেই সে বালির উপর ঘুমিয়ে পড়ল।



ঘুমের ভিতরে কোন্‌খান দিয়ে রাত কেটে গেছে চাও তা টের পায়নি। সকালবেলায় জেগে সে দেখল তার চারধারে মেলাই লোক জড় হয়েছে। তাদের

সকলেরই ভারি মজার চেহারা আর বড় জমকালো পোশাক। তাদের মধ্যে একজন দেখতে খুব সুন্দর, আর তার জামায় আর পাগড়িতে আর ঘোড়ার সাজে খালি হীরা, মোতি আর পান্না ঝলমল করছে। তিনি সেই দেশের রাজার ছেলে। তিনি চাঙকে দেখে বললেন, ‘আহা, না জানি তুমি কত কষ্ট পেয়েছ! তুমি কোথা থেকে আসছ?’

চাঙ বলল, ‘আমার বাড়ি চীন দেশে, বাড়ে জাহাজ ডুবে এখানে এসে পড়েছি।’

যেই এই কথা বলা, অমনি রাজার ছেলে কী খুশি যে হলেন আর চাঙকে কত যে যত্ন করতে লাগলেন কী বলব! সে দেশের লোকে আর কখনো চীন দেশের লোক দেখেনি। তারা খালি শুনেছে যে চীনেরা বড়ই বুদ্ধিমান। রাজপুত্র মনে করলেন, ‘উঃ! কী আশ্চর্য! একটা জ্যাস্ত চীনে মানুষ আমাদের দেশে এসেছে, একে নিয়ে বাবাকে না দেখালেই নয়!’

তারা তখনই চাঙকে একটা চমৎকার ঘোড়ায় চড়িয়ে নিলে। চাঙ তাতে বসে বসে ভাবছে, ‘এইবারে বেশ মজা হবে!’ অমনি ঘোড়া ওকে নিয়ে ঝুপ্ করে সমুদ্রের ভিতরে ডুবে গেল। তাকে ভাল করে ‘মাগো’ বলবারও সময় দিল না। কিন্তু, কী আশ্চর্য! জলে ডুবে কোথায় সে দম আটকে মারা যাবে, না, তার বদলে দেখল যে সে যারপরনাই আরামে আর সকলের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে। জল তাদের পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। সমুদ্রতলায় এমন সুন্দর দেশ আছে, চাঙ তার কিছুই জানত না। সে মনে করত তার চীন দেশই সকলের চেয়ে সুন্দর, কিন্তু এখন দেখল যে এদেশের কাছে সে দেশ কিছুই নয়। আর সেই দেশের যে রাজবাড়ি, তা দেখে তো সে কথাই কইতে পারল না। রামধনুর রঙ দিয়ে, ঝিনুকের ঝিকিমিকি দিয়ে সে-বাড়ি তয়ের করেছে। সেই বাড়িতে সমুদ্রের রাজা থাকেন। তিনি বুড়ো মানুষ। তাঁর দাড়ি-গোঁফ দুধের মতন সাদা আর রেশমের মত ফুরফুরে। এমন সুন্দর মানুষ আর কেউ কখনো দেখেনি। চাঙ বড় খতমত খেয়ে গিয়েছিল, তার বুকের ভিতরে যেন ঢেঁকি ধড়াস ধড়াস করছিল; কিন্তু রাজামশাইকে দেখে তার ভয় চলে গেল। রাজামশাই তাকে দেখে ভারি খুশি হলেন আর বললেন, ‘আমি শুনেছি তোমাদের দেশের লোক ভারি বুদ্ধিমান, আর তারা চমৎকার কবিতা লিখতে পারে। আচ্ছা, আমার এই বাড়িটার কথা দিয়ে একটা কবিতা লেখ তো!’

চাঙের মত কবিতা তো আর কেউ লিখতে পারত না, কাজেই সে তখনই কাগজ কলম নিয়ে বসে মস্ত এক কবিতা লিখে ফেলল। তেমন সুন্দর কবিতা আগে সে নিজেও কখনো



লেখেনি। রাজামশাই সেই কবিতা পড়ে এতই খুশি হলেন যে তিনি ঘাড় নেড়ে, হাত নেড়ে, সুর করে বার-বার করে সেটা পড়তেই লাগলেন। চাঙকে তিনি বাড়ি, ঘর, হাতি, ঘোড়া, লোকজন, জমিদারী কত কিছুই দিলেন, তাতেও তার মন উঠল না, শেষে নিজের মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। সেই মেয়েটি দেখতে যেমন সুন্দরী, তেমনি লক্ষ্মী, তেমনি তার বুদ্ধি। তারপর বছরের পর বছর চাঙের স্ত্রী কেটে গেছে। তাদের যারপরনাই সুন্দর দুটি খোকা হয়েছে। চাঙের মতন সুখী লোক আর নাই, খালি একটি কারণে তার মনে বড় দুঃখ। যতই দিনের পর দিন যাচ্ছে, ততই তার মন তার বাপ-মাকে দেখবার জন্য পাগল হচ্ছে। তাদের কথা ভেবে তার চোখের জল পড়ে। শেষে সে একদিন রাজার মেয়েকে বলল, ‘চল না একবার আমাদের দেশে যাই! আমার মাকে বাবাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে!’

রাজার মেয়ে বলল, ‘হায়! আমরা কী করে যাব? এ দেশের বাইরে গেলেই যে আমরা মরে যাই!’

চাঙ বলল, 'তাই তো, তাহলে আর কী করে হয়?'

রাজার মেয়ে বলল, 'আমরা নাই বা গেলাম, তুমি তোমার মা-বাপকে দেখে এস। কিন্তু

দেখো, যেন এক বছরের বেশি
দেরি কোরো না, তাহলে কিন্তু
আমি কাঁদতে কাঁদতে মরেই
যাব!'



তারপর রাজার মেয়ে এক
থলে মণি-মুক্তো আর একখানি
ছোট আরশি এনে চাঙকে
দিয়ে বলল, 'এই থলেটি
আমার শশুর-শাশুড়িকে দিও,
আর এই আরশিখানি তোমার
কাছে যত্ন করে রেখো। দেশে
গিয়ে তোমার যখনই ইচ্ছা
হবে তখনই এই আরশির
ভিতরে আমাকে দেখতে
পাবে।'

তখন সুন্দর একটি গাড়ি
সেজে এল, সেই গাড়িতে করে
রাজার মেয়ে চাঙকে সমুদ্রের
ধারে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল।
সেখানে চীন দেশের অনেক
জাহাজ ছিল, চাঙ তার
একটাতে চড়ে দেশে এল।

কিন্তু হায় হায়! দেশে
এসে চাঙ দেখল যে তাদের

সে বাড়িতে আর তার বাপ-মা নাই। দোকানটি আগুনে পুড়ে গিয়েছে, আর তার সঙ্গে

তাদের আর যা-কিছু ছিল সব গিয়েছে, একটা ঘটি-বাটিও বাঁচে নাই। তার বাপ-মা এখন একটা পচা গলিতে একটা কুঁড়েঘরে থাকে, ভিক্ষা করে খায়, অনেক দিনই তাও পায় না।

অনেক কষ্টে চাও তাদের খুঁজে বার করল। তারাও মনে করেছে চাও আর নাই, আর তাই ভেবে এতদিন ধরে চোখের জল ফেলেছে। এর মধ্যে যখন চাও এসে তাদের প্রণাম করল, তখন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মনে হল যেন তাদের আর কোন দুঃখই নাই। চাওও তখন হাউ-মাউ করে কাঁদতে লাগল। যা-হোক, সে কোনমতে একটু শান্ত হয়েই ছুটে গিয়ে বাজার থেকে ভাল ভাল খাবার কিনে নিয়ে এল। বাজারে যতদূর ভাল খাবার পাওয়া যায়, তাই দিয়ে মা-বাপকে বেশ করে খাইয়ে তারপর সে সেই রাজার মেয়ের দেওয়া মণি-মুক্তোর থলিটি নিয়ে তাদের জন্যে বাড়ি খুঁজতে বেরোল।

সে-সব মণির এক-একটি দিয়ে সাতটি রাজাকে কিনে ফেলা যায়! তার মা-বাপ যেমন কষ্টে ছিল, দেখতে দেখতে তাদের তেমনি স্ব্থ হয়ে গেল। তারা যখন শুনল যে এত ধনের সবই সেই সমুদ্রের রাজার মেয়ে তাদের দিয়েছে, তখন দিন-রাত খালি হাত তুলে তাকে আশীর্বাদ করতে লাগল।

তার পর থেকে দিন খুব স্ব্থেই যায়, চাও বাবা মায়ের সেবা করে, আর রোজই সেই আরশিটি নিয়ে দেখে রাজার মেয়ে ভাল আছে কিনা। দিনকতক তার মুখখানি বেশ



হাসি-হাসি দেখা গেল, তার পর থেকে মনে হল যেন তার চোখ-দুটি ছলছল করছে। তা দেখে

চাণ্ডের মনে ভারি কষ্ট হল, সে আর দেশে চূপ করে বসে থাকতে পারল না। তার পরদিন সে বাপ-মাকে বলল, ‘আমার যাবার সময় হয়েছে, তোমরা খুশি হয়ে আমাকে যেতে দাও।’

তারাও তাকে অনেক আশীর্বাদ করে বিদায় দিল।

তারপর তাদের ওখান থেকে চাণ্ড সমুদ্রের ধারে এসে জাহাজ ভাড়া করতে গেল।

জাহাজের মাঝি জিজ্ঞেস করল, ‘কোথায় যাবে?’

তখন তো চাণ্ডের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল! যেখানে যাবে সে জায়গার নাম তো সে জানে না! সে জাহাজ ডুবে সেখানে গিয়ে পড়েছিল, কিন্তু কোনদিন তার নাম শোনেনি, কাউকে জিজ্ঞেসও করেনি। সে খালি জানত সেটা একটা দ্বীপ। কাজেই সে আর কী করে!

সে মাঝিকে বলল, ‘তোমরা যত দ্বীপের কথা জান, সেই সব দ্বীপ আমাকে দেখিয়ে আনবে।’

মাঝি কত দ্বীপে জাহাজ নিয়ে গেল, কিন্তু তার একটাকেও চাণ্ড তার সেই দ্বীপ বলে চিনতে পারল না। এদিকে বছর প্রায় ফুরিয়ে আসছে। রাজার মেয়ের চোখ-ছুটি দিয়ে ঝর-ঝর করে জল ঝরছে।

চাণ্ড বলল, ‘হায় হায়! এখন উপায়?’

বলতে-না-বলতেই চাণ্ড চম্কে উঠল। সে শুনল, যেন জলের ভিতর থেকে কে তাকে ডাকছে, ‘বাবা! বাবা!’



সে চেয়ে দেখল যে তারই নিজের ছেলে-ছুটি তাদের ছোট ছোট হাত দু'খানি দিয়ে ডাকছে, আর সেই জলের ভিতর থেকে তাকে চুমো খাচ্ছে।

তারা বলল, 'বাবা, আমাদের পিছু-পিছু তোমাদের জাহাজ চালিয়ে নিয়ে এস, তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য মা আমাদের পাঠিয়েছেন।'

এই কথা বলে সেই খোকা দুটি ঢেউয়ের সঙ্গে খেলা করতে করতে মাছের মতন ছুটে জাহাজের আগে-আগে চলল, আর মাঝি-মাল্লারা পালের উপর পাল ভুলে দিয়ে সবাই মিলে প্রাণপণে 'হেঁইয়ো' করে দাঁড় টেনে তাদের সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগল।

আর একটু পরেই চাঙ লাফিয়ে উঠে বলল, 'আরে থাম থাম! এই যে আমার সেই দ্বীপ!'

বলেই চাঙ বনাৎ বনাৎ করে তাদের এক থলির জায়গায় তিন থলি টাকা বকশিস দিয়ে ছুটে গিয়ে সেই দ্বীপে নামল। মাঝি-মাল্লারা খুশি হয়ে তাকে সেলাম করতে করতে জাহাজ ভাসিয়ে চলে গেল, আর তখনই তার ছেলে-ছুটি হাসতে হাসতে ছুটে এসে তার কোলে লাফিয়ে উঠল।

রাজার মেয়ে তো এর কতদিন আগে থাকতেই গাড়ি নিয়ে সেখানে এসে ভাবছিল, চাঙ কেন আসছে না! চাঙকে দেখে সে কত খুশি হল কী বলব! তারপর তারা গিয়ে রাজার বাড়িতে পৌঁছাল। দেশের লোক আর রাজা নিজেও কম খুশি হলেন না। চাঙও অবিশি খুবই খুশি হল। সে কিছুই বলল না বটে, কিন্তু কবিতা লিখল হাজার দুই তিন।



পাকা ফলার

পাড়াগাঁয়ে এক ‘ফলারে বামুন’ ছিল। তাকে যারা নিমন্ত্রণ করত, তাহা সকলেই গরিব ; দৈ-চিঁড়ের বেশি কিছু খাওয়াবার ক্ষমতা তাদের ছিল না।

ব্রাহ্মণ শুনেছিল যে, দৈ-চিঁড়ের ফলারের চাইতে পাকা ফলারটা ঢের ভাল। সুতরাং এর পর যে ফলারের নিমন্ত্রণ করতে এল, তাকে বলল, ‘পাকা ফলার খাওয়াতে হবে।’ সে বেচারি গরিব লোক—পাকা ফলার কোথা হতে দেবে? তাই সে বিনয় করে বলল, ‘মশাই, পাকা ফলার দেওয়া কি যার তার কাজ? রাজ-রাজ্জা হলে তবে পাকা ফলার দিতে পারে।’

শুনে ব্রাহ্মণ বললো, ‘তবে রাজা যেখানে থাকে, সেইখানে গিয়ে পাকা ফলার খাব।’

ব্রাহ্মণ পাকা ফলার খাবার জন্য রাজার বাড়ি চলেছে। পথে যাকে দেখে তাকেই জিগ্যেস করে, ‘হ্যাঁগো, রাজার বাড়িতে কোন্ খানটায়?’

একজন তাকে রাজার বাড়ি দেখিয়ে বলল, ‘ঐ যে পাকা বাড়ি দেখছো, ঐটে।’

ব্রাহ্মণ ‘পাকা ফলার’ যেমন খেয়েছে, ‘পাকা বাড়ি’ও তেমনি দেখেছে, সুতরাং ‘পাকা বাড়ির’ কথা শুনে সে ভারি আশ্চর্য হয়ে রাজার বাড়ির দিকে তাকাল। সে দেশে সব লোকেরই কুঁড়েঘর; খালি রাজার একটি সুন্দর পাকা বাড়ি ছিল। রাজার বাড়ি দেখে ব্রাহ্মণের মুখ দিয়ে লাল পড়তে লাগলো। সে গদগদস্বরে বললো, ‘পাকা বাড়ি? আহা! পাকা বাড়িই বটে! না হবে কেন, সে যে রাজা, তাই সে অমন বাড়িতে থাকে। ওটা তয়ের করতে না জানি কতো ক্ষীর, ছানা, চিনি লেগেছিল!’

ব্রাহ্মণ মনে করেছিল যে, রাজার বাড়িটা সমস্তই খালি ক্ষীর, ছানা আর চিনি দিয়ে গড়া আর তার খানিকটা উদরস্থ করতে পারলেই তার ‘পাকা ফলার’ খাওয়া হবে। তবে আর দোরি কেন?

এই মনে করে ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি গিয়ে রাজার বাড়ির একটা কোণ কামড়ে ধরল ;
আবার তখনই ‘উঃ—হঃ—হঃ’ করে ছেড়ে দিলো ।

তারপর ভাবতে লাগল, ‘তাই তো, এই পাকা ফলারের এমন নাম !’ আর খানিক
ভেবে বলল, ‘ওঃ হো,
বুঝেছি । নারকেলের মত
আর কি ! ওটা ওর
খোলস—জি নি স টা
ভিতরে আছে ।’

এই বলে আগের
চাইতে দ্বিগুণ উৎসাহে
সে কামড়াতে আরম্ভ
করল । তার ছোটো দাঁত
ভেঙে গেল তাতেও
গ্রাহ্য নেই । কামড়াতে
কামড়াতে সে সেই
কোণের অনেকখানি
ভেঙে ফেলেছে, আর মনে
করছে যে, আর বেশি
দেরি নেই । এর পরই
পাকা ফলার আসবে ।

এমন সময় কোথা
হতে মস্ত পাগড়িওয়ালা
এক দরোয়ান এসে তাকে
ধরে ফেলল, ‘আরে, এ ক্যা করতে হো ? মহারাজকে ইমারৎ খা ডালতে হো ? চলো
তুমু হামারে সাথ !’ এই বলে দরোয়ান তাকে রাজার কাছে নিয়ে চলল ।

দরোয়ানের কাছে সব কথা শুনে রাজা বললেন, ‘কি ঠাকুর, ওখানে কি
করছিলে ?’



ব্রাহ্মণ উত্তর করল, ‘মহারাজ, আমি পাকা ফলার খাচ্ছিলুম। খোলাটা না ভাঙতে ভাঙতেই এই বেটা দরওয়ান আমাকে ধরে এনেছে!’



এই কথা শুনে রাজামশায় হো-হো করে হাসতে লাগলেন, আর বেশ বুঝতে পারলেন যে, ঠাকুরের পেটে অনেক বুদ্ধি! যা হোক, তার সাদাসিধে কথাগুলি রাজার বেশ ভাল লাগল। সুতরাং তিনি হুকুম দিলেন, ‘এই ব্রাহ্মণকে পেটভরে পাকা ফলার খাবার মত ময়দা, ঘি আর মিঠাই দাও।’

ব্রাহ্মণ মনের স্বখে রাজাকে আশীর্বাদ করতে করতে ময়দা, ঘি আর মিঠাই নিয়ে ঘরে ফিরল। আসবার সময় বলে এল যে, পাকা ফলার খেয়ে কাল আবার রাজামশায়কে আশীর্বাদ করতে আসবে।

পরদিন সকালে রাজামশায় মুখ-হাত ধুয়ে রাজসভায় এসেই সেই ব্রাহ্মণকে দেখে জিগ্যেস করলেন, ‘কি

ঠাকুর, কাল পাকা ফলার খেলে কেমন?’

ব্রাহ্মণ বলল, ‘মহারাজ, অতি চমৎকার খেয়েছি! পাকা ফলার কি আর মন্দ হতে পারে! গুঁড়োগুলো আগে গলায় বড্ড আটকাচ্ছিল। জল দিয়ে গুলে খেতে না খেতেই বমি হয়ে গেল।’

ময়দা আর ঘি দিয়ে যে লুচি তৈরি করতে হয়, ব্রাহ্মণ বেচারী তা জানত না। কাজেই সে ঐ কাঁচা ময়দাগুলোকেই ঘি আর মিঠাই দিয়ে মেরে খাবার বিশেষ চেষ্টা করেছে। সহজে তরল হয় না দেখে আবার তার





সঙ্গে জল মিশিয়েছে। খেতে তার খুবই ভাল লেগেছে; তবে পেটে রইল না, এই যা দুঃখ।

রাজা দেখলেন, লুচি নিজে তৈরি করে খেতে হলে আর ব্রাহ্মণের ভাগ্যে পাকা ফলার জুটছে না। সুতরাং তিনি তাঁর রসুয়ে বামুনদের একজনকে ডেকে বললেন, ‘এখান থেকে ময়দা ঘি নিয়ে, তোমার বাড়িতে লুচি তয়ের করে এই ঠাকুরকে পেটভরে পাকা ফলার খাইয়ে দাও।’

রসুয়ে বামুন ফলারে বামুনকে তার বাড়ি দেখিয়ে বলল, ‘আমি তয়ের করে রাখব, বিকেলে আপনি এসে খাবেন। আমি বাড়ি থাকব না, আমার ছেলে আপনাকে খেতে দেবে অথন।’ ব্রাহ্মণ রাজি হয়ে বাড়ি গিয়ে বিকেলবেলার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

রসুয়ে বামুনের সেই ছেলেটা ভাল লোক ছিল না; একটা চোরের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল। রসুয়ে বামুন ফলারে বামুনের জন্মে লুচি-সন্দেশ ইত্যাদি তৈরি করে তার ছেলেকে বলল, ‘সেই লোকটি এলে তাকে বেশ করে খাওয়াস!’ তার ছেলে বলল, ‘তার জন্মে কিছু চিন্তা করো না, আমি তাকে খুব যত্ন করে খাওয়াব অথন।’

এই কথা শুনে রত্নয়ে বামুন রাজবাড়িতে রান্না করতে চলে গেল। রোজ সে এই সময়ে রান্না করতে যায় আর দুপুর রাত্রে ফিরে আসে।

রত্নয়ে বামুন চলে গেলে পর, তার ছেলে ফলারে বামুনের খাবারের আয়োজনে মন দিল। ছু'সেরের বেশি লুচি আর তার মত তরকারি মিঠাই ইত্যাদি প্রস্তুত হয়েছিল। খান-চারেক লুচি আর খানিকটা তরকারি ফলারে বামুনের জন্য রেখে, আর সমস্ত সেই হতভাগা চোর বন্ধু ও নিজের জন্য লুকিয়ে রেখে দিল। ফলারের বামুন এলে সে সেই



চারখানা লুচি তাকে দিল। সে বেচারী জন্মেও লুচি খায়নি, তাতে আবার এমন চমৎকার লুচি—রাজার বামুনঠাকুর নিজে যা তৈরি করেছে! এমন জিনিস ছু-চারখানি মাত্র খেয়ে তার পেট ত ভরলোই না, বরং খিদে আরও বেড়ে গেল। সে খালি দুঃখ করতে লাগল, 'আহা! আর যদি খান-কতক দিত!'

রত্নয়ে বামুনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফলারে বামুন রাস্তা দিয়ে চলেছে। তার মনের দুঃখ রাখবার আর জায়গা নেই! চলে আর বলে, 'যদি আরও খান-কতক দিত!'

এমন সময় হয়েছে কি, রাজার প্রধান ভাণ্ডারি সেই রাস্তা দিয়ে চলেছে। সে নিজের হাতে সেদিন সকালবেলায় ঐ ফলারে বামুনের জন্যে পুরো ছু'সের ময়দা আর তার মত অন্য সব জিনিস মেপে দিয়েছে। ফলারে বামুনের ঐ কথা শুনে ভাণ্ডারি জিগ্যেস করল, 'কি ঠাকুর মশাই! যদি আর খান-কতক কি দিতো?'

ফলারে বামুন বলল, 'বাবা, আমি পাকা ফলারের কথা বলছি। রাজামশাই চিরজীবী হোন, আমাকে এমন জিনিস খাইয়েছেন! খালি যদি আর খান-কতক হতো!'

ভাণ্ডারি জিগ্যেস করল, 'আপনাকে ক'খানা দিয়েছিল?'

ফলারে বামুন বলল, 'চারখানি পাকা ফলার আমাকে দিয়েছিল!'

ভাণ্ডারি জানতো যে রত্নয়ে বামুনের ছেলেটা বড়ো দুষ্ক; কাজেই সে সবই বুঝতে পেরে বলল, 'সেকি ঠাকুরমশাই! ছু'সের ময়দা দিয়েছি, তাতে কি মোটে চারখানা লুচি হয়?'

ব্রাহ্মণ বলল, ‘হ্যাঁ বাপু, চারখানাই ত ছিল, আর তা খেতে খুব চমৎকার লেগেছিল।’

ভাণ্ডারি বলল, ‘তুমি ময়দায় ওর চাইতে ঢের বেশি লুচি হয়। আমার বোধ হচ্ছে, ঐ রসুয়ে বামুনের ছেলেটা বাকি লুচিগুলো মাচায় তুলে রেখেছে। আপনি আবার যান। এবার গিয়ে একেবারে মাচায় উঠবেন; দেখবেন, আপনার লুচি সেখানে আছে।’

ব্রাহ্মণ বলল, ‘তাই নাকি? বাপু, তুমি বেঁচে থাক। হতভাগা বেল্লিক, বাঁদর, শয়তান, পাজি—’ বলতে বলতে ব্রাহ্মণ সেই রসুয়ে বামুনের বাড়ির পানে ছুটল। গালাগালি অবশ্য ভাণ্ডারিকে দেয়নি, রসুয়ে বামুনের ছেলেকেই দিয়েছিল।

রসুয়ে বামুনের ছেলে ফলারে বামুনকে চারখানি লুচি খাইয়ে বিদায় করেই, তার সেই চোর বন্ধুর কাছে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে সে চোরকে বলল, ‘বন্ধু, ঢের লুচি তয়ের করে মাচার উপর রেখে এসেছি। তুমি শীগ্গির যাও, আমি বাজার থেকে একটা জিনিস নিয়ে এখনি আসছি।’

চোর রসুয়ে বামুনের মাচার উপর উঠে সব লুচির ঢাকনা খুলতে যাবে, এমন সময় ফলারে বামুন এসে উপস্থিত। এবারে আর কথাবার্তা নেই, একেবারে মাচায় গিয়ে উঠল। চোর ভারি মুস্কিলে পড়ল। লুকোবারও জায়গা নেই, পালাবারও পথ নেই, এখন সে যায় কোথায়? শেষটা আর কি করে, মাচার এক কোণে একটা কাঠের থাম জড়িয়ে কোন রকমে বেমানুম হয়ে থাকতে চেষ্টা করতে লাগলো। এখন একে সন্ধ্যা, তাতে আবার ফলারে বামুনের মনটা লুচি খাবার জন্যে যারপরনাই ব্যস্ত রয়েছে। স্বতরাং চোরকে সে দেখতেই পেল না—সামনে লুচি, সন্দেশ, তরকারি, মিঠাই সাজানো দেখেই খেতে বসে গেল!

এমন সময়ে ভারি একটা মজা হল। রসুয়ে বামুনের ছেলেও বাজার থেকে ফিরে এসেছে, আর ঠিক সেই সময় রসুয়ে বামুনও এসেছে। অন্ত দিন সে প্রায় দুপুর রাত্রে আগে ফেরে না, কিন্তু সেদিন সে ভুলে একটা বাঁজরা ফেলে গিয়েছিল, সেটার ভারি দরকার।

ছেলে আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করলো, ‘বাবা, তুমি এখনি ফিরে এলে যে?’

রসুয়ে বামুন বলল, ‘বাঁজরা ফেলে গিছলাম, তাই নিতে এসেছি।’

ততক্ষণে ফলারে বামুনের পেট এতো বোঝাই হয়েছে যে, আর একটু হলেই তার দম আটকায়। পিপাসায় গলা শুকিয়ে গিয়েছে, কিন্তু সেখানে জল নেই! সে ‘জল’ ‘জল’ করে চৈঁচাতে চেষ্টা করল, কিন্তু ভাল করে কথাই ফুটল না।



রহুয়ে বামুন তার ছেলেকে জিগ্যেস করল, ‘ওটা কি রে?’ ছেলে দেখল, ভারি মুস্কিল। সে ত আর ফলারে বামুনের কথা জানত না; কাজেই সে মনে করেছে যে, ওটা তার বন্ধু; গলায় সন্দেশ আটকে অমন বিস্ত্রী স্বরে জল চাইছে। বন্ধুর খবরটা দিলে তার বাপ আর বন্ধুবরের একখানা হাড়ও আস্ত রাখবে না! আর কিছু না বললে নিজেই হয়ত মাচায় উঠে দেখবে! এখন উপায়?

এই সময় হঠাৎ ছেলের বুদ্ধি যোগালো! সে বলল, ‘বাবা, ওটা নিশ্চয় ভূত। তা নইলে মাচার ওপর থেকে অমন বিস্ত্রী আওয়াজ দেবে কেন?’ সে জানতো যে, তার বাপের ভূতের ভয়টা একটু বেশি।

ভূতের কথা শুনে রহুয়ে বামুন ত কাঁপতে লাগল। আরও মুস্কিলের কথা এই যে, ভূতটা জল চাইছে। তার কাছে জল নিয়ে যেতে বিছুতেই ভরসা হচ্ছে না, অথচ জল না পেলে নিশ্চয় ভয়ানক চটে যাবে। তারপর সে কি করে, তার ঠিক কি! ছেলের ভারি ইচ্ছে, সে ভূতকে জল দিয়ে আসে। কিন্তু রহুয়ে বামুন বলল, ‘তা হবে না; যদি তোর

বাড় ভেঙে দেয়।' এই সময়ে মনে হল যে, মাচার ওপরে কয়েকটা নারকেল ছাড়ান আছে; স্ততরাং সে ভূতকে ডেকে বলল, 'মাচায় নারকেল আছে; থামে আছড়ে ভেঙে খাও।' - তারপর হাঁপ ছেড়ে বলল, 'বাবা, বড্ড বেঁচে গেছি! নারকেলগুলো না থাকলে, আজ প্রাণ গিয়েছিল আর কি!'

ফলারে বামুনের হাতের কাছেই নারকেলগুলো ছিল; সে তার একটা হাতে নিয়ে থামে আছড়ে ভাঙতে গেল। সেই থাম জড়িয়ে চোর দাঁড়িয়েছিল। ব্রাহ্মণ পিপাসার চোটে থাম মনে করে সেই চোরের মাথাতেই নারকেল আছড়ে বসেছে—একেবারে মাথা ফাটিয়ে ফেলবার যোগাড় আর কি!

এর পর একটা মস্ত গোলমাল হল। নারকেলের বাড়ি খেয়ে চোর ভয়ানক চঁচিয়ে উঠল; আর তাতে ভয়ানক চমকে গিয়ে ব্রাহ্মণও হাউ-মাউ করতে লাগল। গোলমাল শুনে পাড়ার সমস্ত লোক সেখানে এসে জড়ো হল। আসল কথাটা জানতে এর পর আর বেশি দেরি হল না। চোর ধরা পড়ল; আর রহস্যে বামুন তার ছেলেকে সেই ঝাঁজরা দিয়ে এমনি ঠেঙান ঠেঙাল যে, কি বলব!



পাজি পিটার

শহরের কোণে মাঠের ধারে এক পুরনো বাড়িতে 'পিটার' থাকতো। তার আর কেউ ছিল না, খালি এক বোন ছিল। পিটারকে সবাই বলত 'পাজি পিটার'—কারণ পিটার কোন কাজকর্ম করে না—কেবল একে ওকে ঠকিয়ে খায়। পিটার একদিন ভাবল, ঢের লোক ঠকিয়েছি—একবার রাজাকে ঠকানো যাক। এই ভেবে সে রাজবাড়ি গেল।



রাজা বললেন,
'তুমি কে হে,
মতলবখানা কী?'

পিটার বলল,
'আজ্ঞে, আমি
পাজি পিটার—
ঠকাবার জন্য লোক
খুঁজছি।'

রাজা বললেন,
'তাই নাকি? লোক
খোঁজবার দরকার
কী, আমাকেই
একবার ঠকিয়ে
দেখাও না।' পিটার
মাথা চুলকোতে
লাগল। বলল,
'তাই ত, আমার

সরঞ্জাম সব বাড়িতে ফেলে এসেছি।’ রাজা বললেন, ‘বেশ ত, তোমার সরঞ্জাম সব নিয়ে এস।’ পিটার তাই শুনে ভয়ানক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল, আর বলল, ‘দোহাই মহারাজ, অত হাঁটাহাঁটি করলে আমি মরেই যাব।’ রাজা বললেন, ‘তবে এই ঘোড়াটায় চড়ে যা—দেরি করিসনি।’ পিটার চিৎকার করতে লাগল, ‘ও ঘোড়ায় আমি চড়ব না—ঘোড়া আমায় ফেলে দেবে।’ কিন্তু সে-কথা কেউ শুনল না, তাকে জোর করে ঘোড়ায় চড়িয়ে দেওয়া হল। পিটার ঘোড়াটাকে আস্তে আস্তে মোড়ের কাছে নিয়ে গিয়ে—যেই একটু আড়াল পেয়েছে, অমনি ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে শহরের বাইরে উপস্থিত! সেখানে সাজ-সরঞ্জাম স্তব্ধ ঘোড়াটাকে বিক্রি করে সে পকেটভরে টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরল। এদিকে রাজা-উজীর পাত্র-মিত্র সভায় বসে—পিটার আসে না, আসে না—এলই না। রাজামশাই বাইরে খুব হাসলেন, বললেন, ‘ছেলেটা বেজায় চালাক।’ কিন্তু মনে মনে ভারি চটলেন।

একদিন পিটার দেখতে পেল মাঠের উপর দিয়ে জমকালো পোশাক পরে ঘোড়ায় চড়ে তলোয়ার হাতে কে যেন আসছে। পিটার ভাবল, এই মাটি করেছে! রাজা আসছে। পিটার দৌড়ে তার বোনকে বলল, ‘ভাতের হাঁড়িটা উনুনে চড়িয়ে দাও—ফুটতে থাকুক।’ এই বলে সে একখানা ভাঙা শিলের উপর হিজিবিজি কী সব লিখতে বসল। তারপর যেই রাজামশাই তার বাড়ির সামনে এসেছেন, অমনি সে ফুটন্ত ভাতের হাঁড়িটাকে সেই শিলের উপর বসিয়ে বিড়বিড় করে কী সব বলতে বলতে ভাতটাকে কাঠি দিয়ে নাড়তে লাগল। রাজামশাই বললেন, ‘এ আবার কী?’ পিটার বলল, ‘আজ্ঞে, ভাত রান্ধছি।’ রাজা বললেন, ‘সে কী রে! তোর আগুন কই?’ পিটার জোড়হাতে বলল, ‘মহারাজ, আমরা গরিব মানুষ, আগুন-টাগুন কোথায় পাবো? সন্ধ্যাসি ঠাকুর এই পাথরখানা দিয়েছেন আর দুটো মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছেন, তাতেই আমাদের রান্না চলে যায়।’

রাজা বললেন, ‘দে, ওটা আমায় দে—তাকে আমি মাপ করে দিচ্ছি।’ পিটার কঁাদতে লাগল, দেখাদেখি তার দুফু বোনটাও কঁাদতে লাগল। রাজা বললেন, ‘অত কান্নাকাটির দরকার কী? আমি ত কেড়ে নিচ্ছি না—দাম দিয়ে নিচ্ছি। এই নে।’ বলে তিনি একমুঠো মোহর ফেলে দিলেন। তখন পিটার তাঁকে একটা যা-তা মন্ত্র শিখিয়ে দিল।

রাজামশাই সেই শিলখানা নিয়ে বাড়ি গেলেন। গিয়ে সকলকে বলে পাঠালেন, ‘কাল সকালে তোমাদের এক আশ্চর্য ভোজ খাওয়াব।’ সকাল না হতেই মন্ত্রী উজীর কোটাল সকলে আশ্চর্য ভোজ খাবার জন্য রাজবাড়িতে হাজির। রাজামশাই সেই পাথরটিকে ঘরের



মধ্যে বসিয়ে তার
ওপর প্রকাণ্ড এক
হাঁড়ি চাপালেন, আর
পোলাওয়ের চাল, ঘি,
মাংস, মশলা সব তার
মধ্যে দিয়ে গম্ভীর-
ভাবে মন্ত্র পড়তে
লাগলেন। পাঁচ মিনিট
গেল, দশ মিনিট গেল,
ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে
গেল, পোলাও আর
হল না। সকলে মুখ
চাওয়া-চাওয়ি করতে
লাগল। রাজামশাই
রেগে ঘেমে লাল হয়ে
উঠলেন। শেষটায়
তিনি লাফিয়ে উঠে
কাউকে কিছু না বলে
এক তলোয়ার হাতে
আবার ঘোড়ায় চড়ে
পিটারের বাড়ি
ছুটলেন। মনে মনে
বললেন, ‘এবারে আর
পাজি পিটারকে আস্ত
রাখছিনে।’

দূর থেকে রাজাকে
দেখেই পিটার এক

দৌড়ে শোবার ঘরে গিয়ে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল। তার বোনকে সে আগে থেকেই সব শিখিয়ে রেখেছিল—সে করল কী, একটা খরগোশ কেটে তার রক্ত দিয়ে একটা থলি ভরে সেই থলিটা বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখল।

রাজা ঘরে ঢুকেই জিগ্যেস করলেন, ‘পিটার কই? তাকে শীগ্গির ডাকো।’ পিটারের বোন বলল, ‘দোহাই মহারাজ, পিটার এখন ঘুমোচ্ছে, সে ভয়ানক রাগী লোক, এখন জাগাতে গেলে আমায় মারবে।’ রাজা বললেন, ‘কিছু ভয় নেই—আমি আছি।’

পিটারের বোন পিটারকে ডাকতে গেল। খানিক বাদেই একটা গর্জনের মত শোনা গেল, রাজা গিয়েই দেখেন, পিটার একটা ছুরি নিয়ে তার বোনকে মারলো আর সে বেচারী ঠিক যেন মড়ার মত পড়ে গেল—রক্তে তার কাপড় লাল হয়ে গেল। রাজা বললেন, ‘তবে রে পাজি পিটার, তোর বোনটাকে শুধু-শুধু মেরে ফেললি? পিটার বললে, ‘মহারাজ, এক মিনিট সবুর করুন!’ এই বলে সে একটা ভাঙা শিঙের বাঁশি নিয়ে তার বোনের চোখে-মুখে ফুঁ দিতে লাগল। এক মিনিটের মধ্যে মেয়েটা চোখ মেলে বড় বড় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে বসল। রাজা ত অবাক! তিনি বললেন, ‘এই শিঙেটা আমায় দিতে হবে।’ পিটার কাঁদতে লাগল, বলল, ‘দোহাই মহারাজ, ওটা না হলে আমাদের চলবে কেমন করে?’ দেখাদেখি বোনটাও কাঁদতে লাগল, ‘এবার মারা গেলে কি করে বাঁচাবে? দোহাই মহারাজ, পিটারের মেজাজ বড় ভয়ানক।’

রাজা বললেন, ‘আমার মেজাজ তার চাইতেও ভয়ানক—তোদের যে মেরে ফেলিনি এই ঢের—এই নে—’ বলে একমুঠো মোহর ফেলে দিলেন।

রাজা বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবলেন, এবার থেকে যার উপর রাগ করব—একেবারে তলোয়ারের কোপ বসিয়ে দেব।’ বাড়ি ফিরে দেখেন—নিমন্ত্রিত লোকেরা তখনও আশ্চর্য ভোজ খাবার আশায় বসে আছে। মন্ত্রী বললেন, ‘মহারাজ, আহারের অন্ন বন্দোবস্ত করতে বলব কি?’ রাজা বললেন, ‘কী, এতবড় কথা! আমি করছি একরকম বন্দোবস্ত আর তুমি করবে অন্ন রকম?’ বলেই মন্ত্রীর মাথায় এক কোপ বসিয়ে দিলেন। উজির নাজীর কোটাল সব হাঁ-হাঁ করে উঠতেই রাজা ঘ্যাচ্ ঘ্যাচ্ করে তাদের মাথা কেটে দিলেন। চারিদিকে হুলস্থূল পড়ে গেল। রাজা বললেন, ‘ভয় নেই, তোমরা এখন মজা দেখ!’ বলে

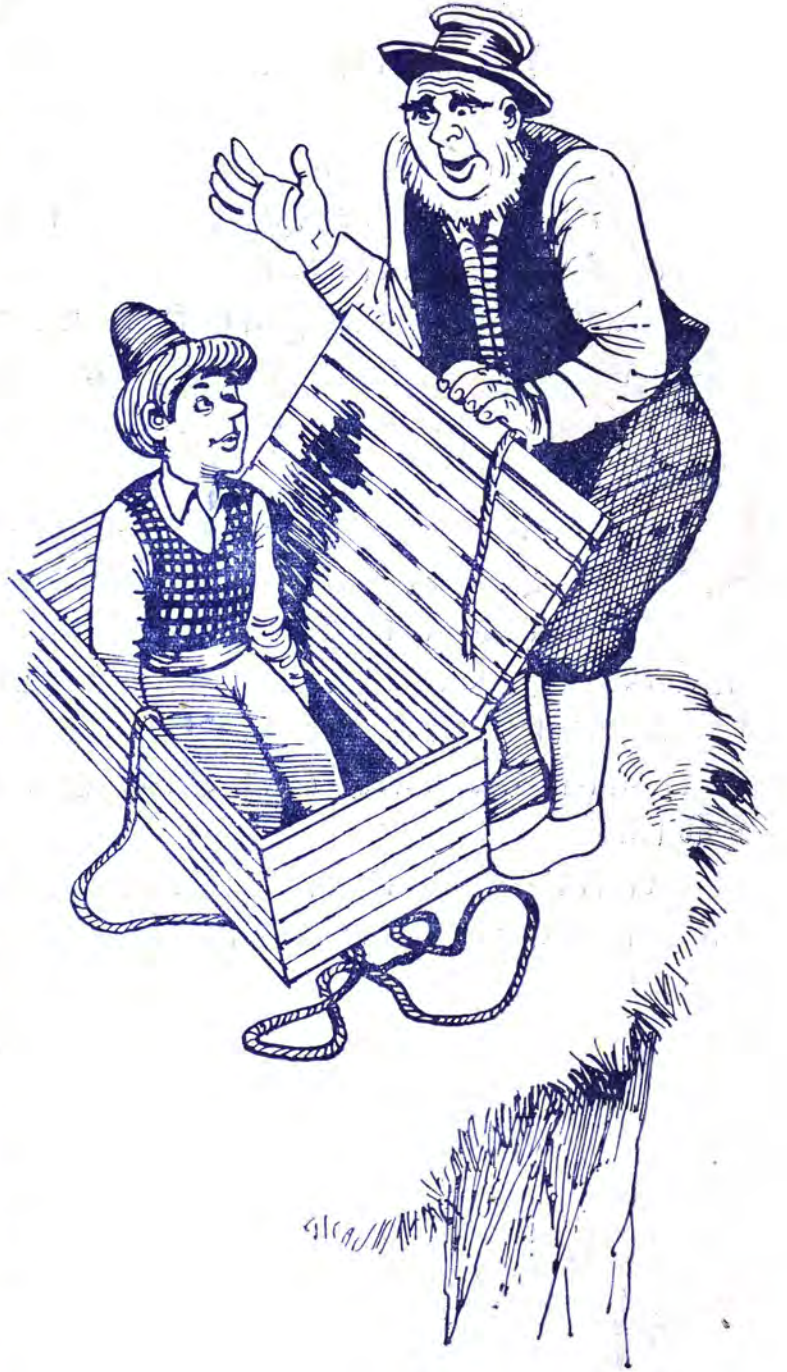


তিনি সেই শিঙেটা মন্ত্রীর মুখের কাছে নিয়ে ফুঁ দিতে লাগলেন। কস্তি ফুঁ দিলে হবে কী—
মরা মানুষ কি আর বাঁচে?

তখন রাজার হুকুমে লোকজন পেয়াদা পুলিশ দৌড়ে গিয়ে পিটারকে ধরে আনল।
একটা মজবুত বাক্সের মধ্যে তাকে বন্ধ করে সেই বাক্স মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা হল। রাজা
বললেন, ‘পাজি পিটার, তোমার শাস্তি শোন—এই বাক্সে ভরে তিন দিন তিন রাত্রি
তোমাকে ঐ পাহাড়ের উপর রাখা হবে। সেখানে রোদে পুড়ে হিমে ভিজে তুমি তোমার
ছুকুমির কথা ভাববে—তারপর তোমাকে ওই পাহাড় থেকে একেবারে সমুদ্রে ফেলে
দেওয়া হবে।’ পিটার বলল, ‘আহা মহারাজের দয়ার শরীর!’ পাহাড়ের আগায় বাক্সের
মধ্যে শুয়ে পিটার মনে মনে ভাবছে, ‘এখন উপায়!’ আর মুখে চিৎকার করে গান করছে—

‘ধিন তা ধিনা তা ধেই ধেই
স্বর্গে যাবার রাস্তা এই—’

এমনি করে দু'দিন গেল।
 তিন দিনের দিন এক বুড়ো
 বিদেশী সওদাগর সেখানে
 এল। সে বেচারা তীর্থ করতে
 বেরিয়েছে, পিটারের গান
 শুনে ব্যাপারটা কী দেখতে
 এল। সওদাগর বলল, 'তুমি
 কে ভাই? স্বর্গের রাস্তার
 কথা বলছিলে? পিটার বলল,
 'আরে চুপ! কাউকে বলো না
 —তা হলে স্বর্গে যাবার জন্যে
 কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে—মার
 থেকে আমার স্বর্গে যাওয়া
 মাটি হবে।' সওদাগর বলল,
 'ভাই, তুমি একা যাবে কেন?
 আমাকে একটু পথ বাতলে
 দাও না!' পিটার বলল,
 'সকলের কি তা সম্ভব হয়?
 এই বাব্বকে মন্ত্র পড়ে এখানে
 রাখা হয়েছে, যেমন-তেমন
 বাব্ব হলে হবে না; আজ
 রাত্রে শেষে স্বর্গের দূত এসে
 আমায় নিয়ে যাবে। আবার
 যে-সে দিনে হবে না—এমনি
 তিথি, এমনি বার, এমনি মাস,
 এমনি নক্ষত্র সব মেলা চাই—
 এরকম স্বযোগ হাজার বছরে



একদিন হয়। সওদাগর বলল, ‘ভাই, আমি বুড়ো হয়েছি, কবে মরে যাই তার ঠিক নেই—আমার টাকাকড়ি ঘরবাড়ি সব তোমায় লিখে দিচ্ছি। তুমি আমায় ও বাক্সটা দাও—আমি স্বর্গে যাই।’ পিটার বলল, ‘খবরদার, আমি ছেলেমানুষ বলে আমায় টাকার লোভ দেখিও না।’ বুড়ো কাঁদতে লাগল; অনেক মিনতি করে বলতে লাগল, ‘এই বুড়ো বয়সে তীর্থ ঘুরে কতটুকু আর পুণ্য হবে—এখন না হলে আর আমার স্বর্গে যাবার আশা নেই।’ তখন পিটার রাজি হল।

বাক্স খুলে বুড়ো তার মধ্যে ঢুকল। পিটার তার কাছ থেকে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়ে বাক্সটা আবার দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। যাবার সময় বলে গেল, ‘রাত্রের শেষে স্বর্গের দূত আসবে—তখন কিন্তু টু শব্দটি করবে না। তা হলে আর স্বর্গে যাওয়া হবে না।’

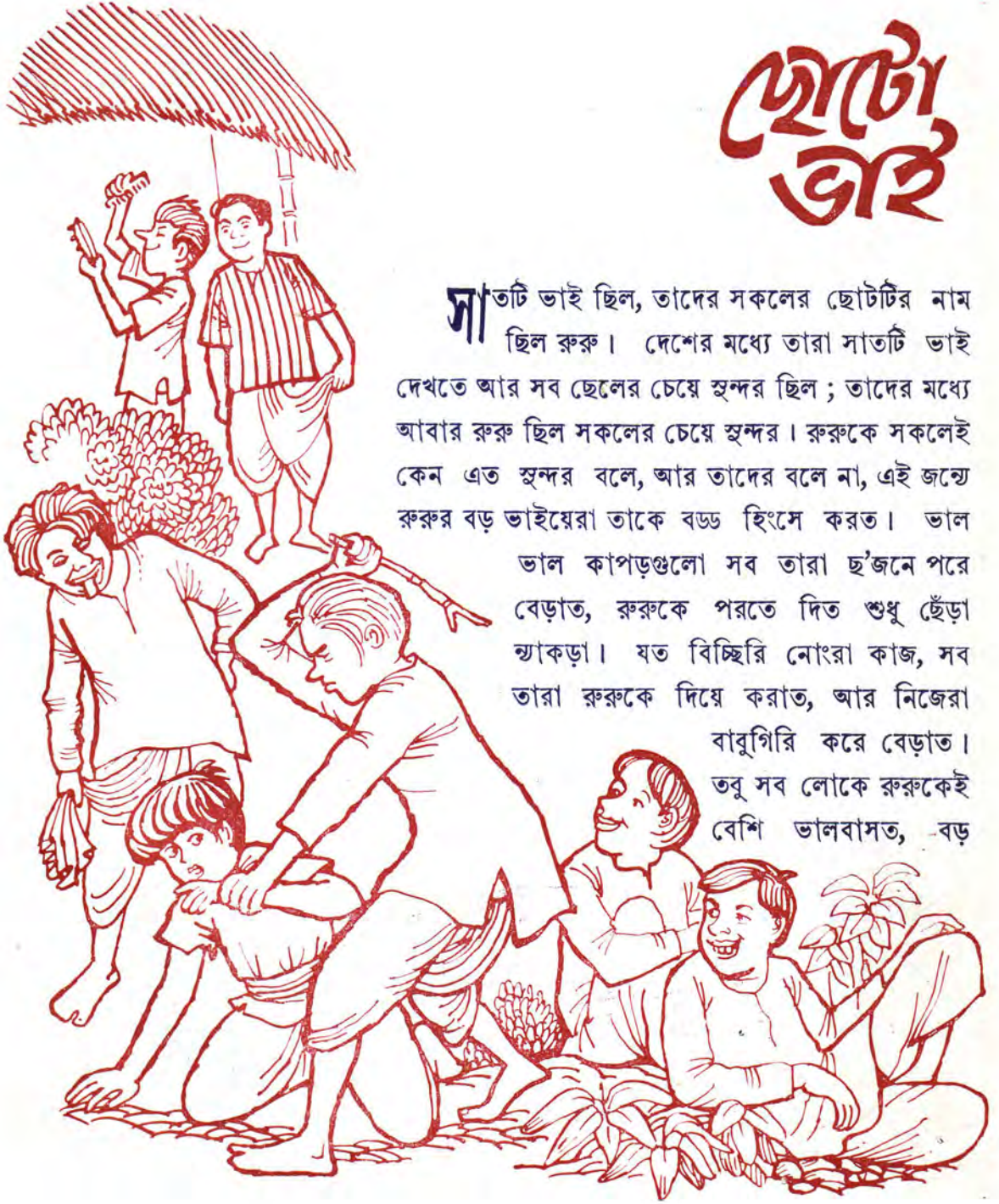
রাত্রে রাজামশাই শাল্ত্রী নিয়ে বাক্সটা ছুঁড়ে সমুদ্রে ফেলে দিলেন। রাজা ভাবলেন, আপদ গেল। দু’দিন বাদে রাজা বেড়াতে বেরিয়েছেন এমন সময় পাজি পিটার জমকালো পোশাক পরে ধবধবে সাদা ঘোড়ায় চড়ে এসে সেলাম করে বলল, ‘মহারাজ, আমায় সমুদ্রে ফেলে বড়ই উপকার করেছেন। আহা! সমুদ্রের তলায় যে দেশ আছে—সে বড় চমৎকার জায়গা। আর লোকেরা যে কী ভাল, তা আর কী বলব! আমায় কি ছাড়তে চায়? আসবার সময় থলিভরে কেবল হীরে-মণি-মুক্তো সঙ্গে দিল।’ এই বলেই সে চম্পট দিল।

রাজামশাই হাঁ করে রইলেন। রাজামশাই জানতে চান সমুদ্রের তলাটার কথা পাজি পিটার যা যা বলেছে তা সত্যি কি না—তা হলে তিনি একবার দেখে আসেন।



ছোটো ভাই

সাতটি ভাই ছিল, তাদের সকলের ছোটটির নাম ছিল রুহু। দেশের মধ্যে তারা সাতটি ভাই দেখতে আর সব ছেলের চেয়ে সুন্দর ছিল; তাদের মধ্যে আবার রুহু ছিল সকলের চেয়ে সুন্দর। রুহুকে সকলেই কেন এত সুন্দর বলে, আর তাদের বলে না, এই জন্যে রুহুর বড় ভাইয়েরা তাকে বড্ড হিংসে করত। ভাল ভাল কাপড়গুলো সব তারা ছ'জনে পরে বেড়াত, রুহুকে পরতে দিত শুধু ছেঁড়া শ্যাকড়া। যত বিচ্ছিরি নোংরা কাজ, সব তারা রুহুকে দিয়ে করাত, আর নিজেরা বাবুগিরি করে বেড়াত। তবু সব লোকে রুহুকেই বেশি ভালবাসত, বড়



ক'টিকে কেউ দেখতে পারত না। তাতে তারা আরো চটে রুগ্নকে যখন তখন ধরে ঠেঙাত, বেচারাকে এক দণ্ডে স্থখে থাকতে দিত না।

রুগ্নদের গ্রাম থেকে ঢের দূরে ররঙ্গা বলে একটি মেয়ে থাকত। এমন সুন্দর মেয়ে এই পৃথিবীতে আর কোথাও ছিল না। তার কথা শুনেই রুগ্নর দাদারা বলল, 'চল, আমরা সেই মেয়েকে দেখতে যাব। আমাদের মত সুন্দর ছেলে আর কোথায় আছে? আমাদের দেখলে নিশ্চয়ই সেই মেয়ে আমাদের একজনকে বিয়ে করে ফেলবে।'

তখন তো তাদের খুবই আনন্দ আর উৎসাহ হল। ছ'জনের প্রত্যেকে ভাবল, 'ররঙ্গা নিশ্চয় আমাকেই বিয়ে করবে!' কত কাপড়, কত গয়না এনে যে তারা তাদের ছ'টি পুটলির ভেতরে পুরল, তার লেখাজোখা নেই। মস্তবড় পানসি তাদের জন্যে তয়ের হল, ছ'ভাই মিলে আজ কত রকম করেই পোশাক পরেছে আর চুল আঁচড়েছে; একটু পরে তারা সেই পানসিতে চড়ে বউ আনতে যাবে।

মা জিগ্যেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, তোরা রুগ্নকে সঙ্গে নিবি না?'

অমনি তারা ছ'জনে একসঙ্গে বলল, 'নেব বই কি। নইলে আমাদের রান্না কে করবে? কে জল তুলবে? ররঙ্গাকে দেখতে যাবার সময় আমরা তাকে আমাদের বাসায় রেখে যাব। ও যা ছেঁড়া কাপড় পরে, ও আমাদের ভাই, এ-কথা জানলে লোকে কী বলবে?'

রুগ্ন সবই শুনল, কিন্তু কিছু বলল না। সেও তার দাদাদের সঙ্গে সেই পানসি চড়ে ররঙ্গাদের দেশে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানকার লোকেরা এর আগেই শুনতে পেয়েছিল যে, কয়েকটি খুব সুন্দর ছেলে তাদের বউ খুঁজতে যাচ্ছে। তারা সেই পানসি পৌছবামাত্রই





রুরুর দাদাদের আদর করে তাদের গ্রামে নিয়ে গেল। সেখানে তারা বাড়িঘর সাজিয়ে মস্ত ভোজের আয়োজন আগেই করে রেখেছিল।

ছ'ভাই হাসতে হাসতে ছলতে ছলতে তাদের সঙ্গে চলে গেল। রুরুরকে বলে গেল, 'আমাদের জন্য একটা বাসা ঠিক করে জিনিসপত্র সব তাতে নিয়ে রাখবি।'

তারপর তাদের খাওয়াদাওয়া, আমোদ-আহ্লাদ খুবই হল। সেখানে অনেক মেয়ে ছিল, কিন্তু তাদের কোন্টি যে ররঙ্গা, ছ'ভাইয়ের কেউ তা বুঝতে পারল না। তাদের প্রত্যেকেই তার পাশের মেয়েটিকে চুপি চুপি জিগ্যেস করল, 'কোন্টি ররঙ্গা?' সেই মেয়েদের প্রত্যেকেই বলল, 'আমিই ররঙ্গা; কাউকে বলো না।'

এ-কথা শুনে তো আর ভাইদের আনন্দের সীমাই রইল না। অত সহজে ররঙ্গাকে পেয়ে ফেলবে, তা তারা মোটেই ভাবেনি। তারা তখনই সেই মেয়েগুলোর সঙ্গে বিয়ের কথা ঠিক করে ফেলল। তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের বিয়ে হয়ে গেল। সকলেই ভাবল, ররঙ্গাকে বিয়ে করেছে। ঠকেছে যে, সে-কথা কারুরই মনে হল না।

রুরুর বেচারা এত কথার কিছু জানে



না, আর তার জানবার দরকারই বা কী? প্রথম দিন বাসা ঠিকঠাক করে সে কলসী হাতে জল আনতে বেরিয়েছিল। জল কোথায় আছে তা ত আর সে জানে না, তাই সে একটি ছোট্ট মেয়েকে জিগ্যেস করল, 'হ্যাঁ গা, কোথায় জল পাব?' মেয়েটি বলল, 'ঐ যে ররঙ্গার বাড়ি, তারই পাশে একটা বরনা আছে।'

রুরুর সেই দিকে জল আনতে চলল। যেতে যেতে সে ভাবল, ররঙ্গা ত ভোজে গিয়েছে; এর মধ্যে আমি একটু উঁকি মেরে দেখে নিই না, তার বাড়িটি কেমন। এই ভেবে সে আস্তে আস্তে সেই ঘরটির দরজার কাছে গিয়ে উঁকি মারলো। উঁকি মেরে আর তার সেখান থেকে চলে আসার কথা মনে রইল না। সে দেখল, ঘরের ভেতরে ররঙ্গা বসে আছে! নিশ্চয় সে ররঙ্গা, নইলে এত সুন্দর আর কে হবে?

ররঙ্গা তাকে দেখেই ভারি খুশী হয়ে অমনি তাকে ডাকল, 'এস এস, ঘরে এস।' রুরুর জড়সড় হয়ে ঘরে গেল। তখন ররঙ্গা জিগ্যেস করল, 'তুমি কে?'



রুফু বলল, 'সেই যে ছ'জন লোক বউ খুঁজতে এসেছে, যাদের জন্য ভোজ হচ্ছে, আমি তাদের ছোট ভাই।'

ররঙ্গা বলল, 'তুমি কেন তবে ভোজে যাওনি?'

রুফু বলল, 'আমাকে তারা নিয়ে যায়নি, কাজ করবার জন্যে বাসায় রেখে গেছে। আমার এর চেয়ে ভাল কাপড় নেই; এইগুলো কাজ করতে করতে ময়লা হয়ে ছিঁড়ে গেছে।'

রুফুকে দেখেই ররঙ্গার যারপরনাই ভাল লেগেছিল, তার কথা শুনে তার বড়ই দুঃখ হল। সে বুঝতে পারল যে, রুফুর দাদারা বড় দুর্ভাগ্য, তাকে কষ্ট দেয়। তখন রুফুকে তার আরো ভাল লাগল। দু'দিন পরে তাদের বিয়েও হয়ে গেল।

তার পরদিন রুফুর দাদারা বউ নিয়ে ঘরে যাবে। রুফু যে তার আগেই ররঙ্গাকে নিয়ে নৌকোর তলায় লুকিয়ে রেখেছে, সে-কথা তাদের কেউ টের পায়নি। তারা ভারি ধুমধাম করে দেশে এল। তারপর বউ নিয়ে বাড়িতে পা দিয়েই সকলের বড় ভাই তাদের মাকে বলল, 'এই দেখ মা, ররঙ্গাকে বিয়ে করে এনেছি!'

অমনি তার ছোট ভাই তার চেয়ে বেশি করে চোঁচিয়ে বলল, 'না মা, ও মিছে কথা বলছে; আমি ররঙ্গাকে এনেছি।'

তখন ত ভারি একটা মজা হল। সবাই বলছে, 'ওর কথা মিথ্যে, আমি ররঙ্গাকে এনেছি।'

ভয়ানক চটাচটি, মারামারি হয়-হয়। বউ ক'টি থতমত খেয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, তারা ভাবেনি যে, অত সহজে ধরা পড়ে যাবে।

তখন মা বললেন, 'বাবা, ররঙ্গা ত ছ'টি নয়, আর এদের একটিও তেমন সুন্দরী নয়। তোমরা ঠকে এসেছ।'।

মার কথা শুনে রুরুর বলল, 'ঠিক বলেছ মা, ঠকে এসেছে। আমার সঙ্গে এস, আমি ররঙ্গাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'।

এই কথায় রুরুর দাদারা তো হেসেই গড়াগড়ি দিতে লাগল ; কিন্তু মা বললেন, 'আচ্ছা, গিয়েই দেখি না।' বলেই তিনি রুরুর সঙ্গে নৌকোয় এলেন, আর একটিবার ররঙ্গার মুখের দিকে চেয়েই তাকে কোলে নিয়ে আনন্দে নাচতে লাগলেন। সে-খবর দেখতে দেখতে গ্রামময় ছড়িয়ে পড়ল। তখন পাড়ার ছেলে-বুড়ো, গিন্নী, বউ, ঝি সকলে ছুটে এসে ররঙ্গাকে ঘিরে নাচতে লাগল।

এ-সব দেখে দাদারা চোখ লাল করে, দাঁত খিঁচিয়ে তাদের স্ত্রীদের বলল, 'বটে! ফাঁকি দিয়েছিস সব!'

শুনে সকলে হো-হো করে হাসলো।

তাদের মা বললেন, 'আর কেন বাছা? চুপ কর! তোমরা যেমন, তোমাদের তেমনি জুটেছে।'।



ফুলপরী

আমি কখনো পরী দেখিনি। তোমরা কি দেখেছ?

পরী আবার কোথেকে দেখব? পরী কি আছে?

আগের লোকেরা বলত, ‘পরীরা তাদের ছোট্ট ছোট্ট ডানা মেলে চাঁদের আলো বেয়ে আসে, ফুলের ভিতর ঢুকে নুকোচুরি খেলে, আর ব্যাঙের ছাতার তলায় হাত-ধরাধরি করে নাচে, আর জোনাকি-পোকার গর্তে ছোট্ট খোকাখুকিদের ঘরে এসে উঁকি মারে।’

নীল সাগরের মাঝখানে কঁাকর মাটির দেশ আছে। সেইখানে কালো কালো মানুষ থাকে, তাদের কঁকড়া কঁকড়া চুল। তারা বলে ফুলপরী তাদের দেশে থাকত। সে তার সোনার আঙুল দিয়ে ফুলদের গাল টিপে দিত। ভোরবেলার লাল আলো দিয়ে তাদের স্নান করাতো, আর ফুরফুরে হাওয়ায় হিমের জল মিলিয়ে তাদের খেতে দিত। ফুলেরা তাকে দেখতে পেলেই মুখ তুলে হাসত, আর সে কাছে না থাকলে মাথা হেঁট করে থাকত।

সেটা কিন্তু ফুলপরীর দেশ ছিল না, তার দেশ ছিল স্বর্গে। সেইখান থেকে সে ফুল নিয়ে এসেছিল, তারপর একদিন সে তার দেশে চলে গেল। তখন তাকে দেখতে না পেয়ে ফুলেরা মাথা হেঁট করে চোখের জল ফেলতে লাগল। আর তারা মুখ তুলে চাইল না, তারা শুকিয়ে গেল, শেষে ঝরে পড়ে গেল।

তারপর আর সে দেশের গাছপালায় ফুল হয় না। সে দেশের লোকের বড় দুঃখ হল।

তারা বলল, ‘হায়, ফুল নাই, আমরা কেমন করে থাকব?’

তাদের মধ্যে ছয়জন বড়ো মানুষ ছিল, তাদের চুল দাড়ি ধবধবে সাদা। তারা বড় ভাল ছিল, আর তাদের খুব বুদ্ধি ছিল।

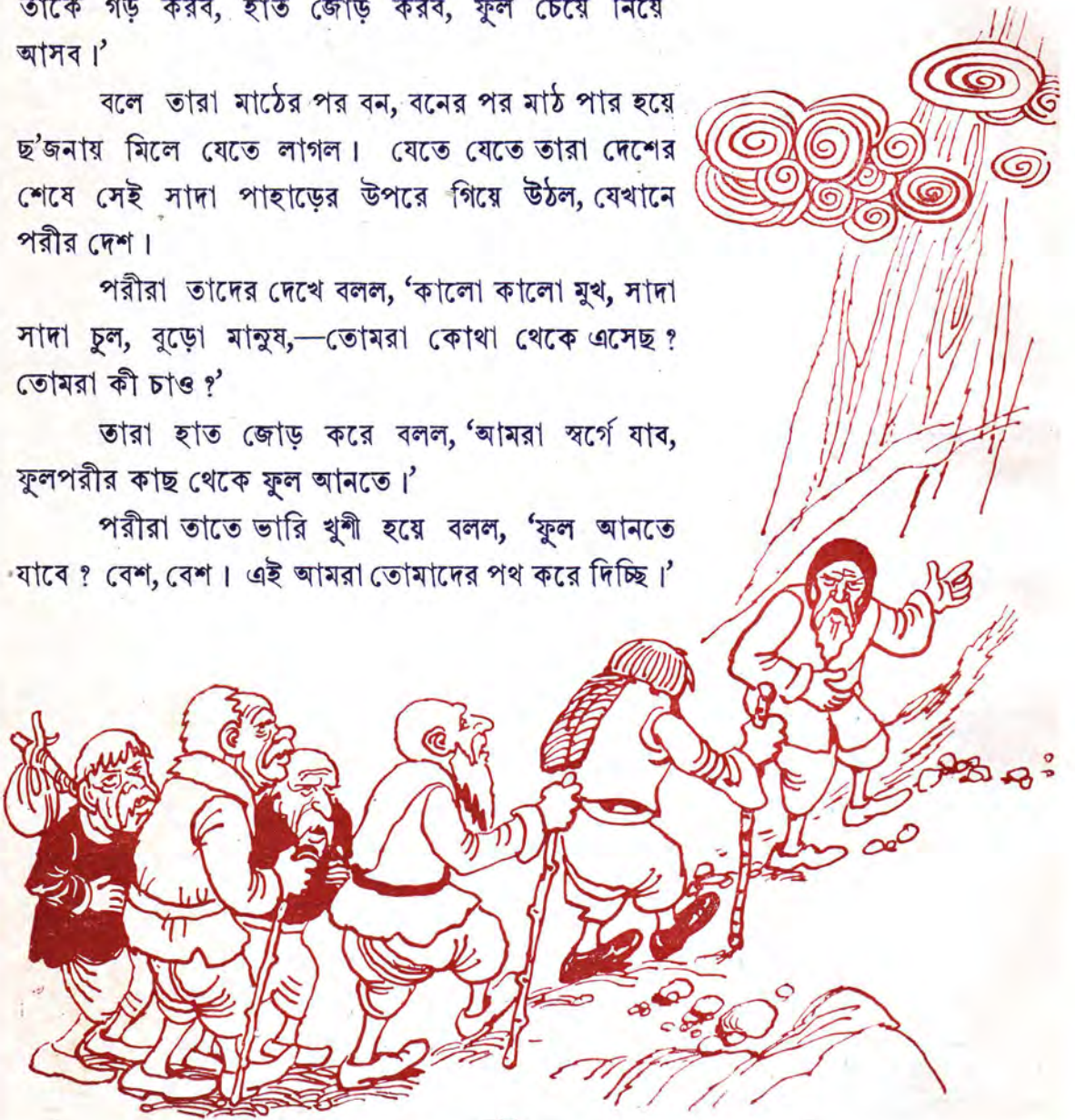
তারা বলল, ‘ফুল থাকবে না, তাও কি হয় ?
আমরা যাব সেই স্বর্গে, সেখানে ফুলপরীর দেশ। গিয়ে
তাকে গড় করব, হাত জোড় করব, ফুল চেয়ে নিয়ে
আসব।’

বলে তারা মাঠের পর বন, বনের পর মাঠ পার হয়ে
ছ’জনায় মিলে যেতে লাগল। যেতে যেতে তারা দেশের
শেষে সেই সাদা পাহাড়ের উপরে গিয়ে উঠল, যেখানে
পরীর দেশ।

পরীরা তাদের দেখে বলল, ‘কালো কালো মুখ, সাদা
সাদা চুল, বুড়ো মানুষ,—তোমরা কোথা থেকে এসেছ ?
তোমরা কী চাও ?’

তারা হাত জোড় করে বলল, ‘আমরা স্বর্গে যাব,
ফুলপরীর কাছ থেকে ফুল আনতে।’

পরীরা তাতে ভারি খুশী হয়ে বলল, ‘ফুল আনতে
যাবে ? বেশ, বেশ। এই আমরা তোমাদের পথ করে দিচ্ছি।’



ব'লে তারা তাদের ছোট ছোট হাতে করে জল নিয়ে সূর্যের মুখে ছড়িয়ে দিতে লাগল, আর যারপরনাই হৃন্দর একটি রামধনু হল। সেই রামধনু সেই পাহাড় থেকে গিয়ে একেবারে স্বর্গের সোনার দরজায় ঠেকল।

তখন পরীরা বলল, 'এর উপর দিয়ে যাও, ফুলপরীর দেখা পাবে।'।

তখন সেই ছয়জন বুড়ো মানুষ সেই রামধনু বেয়ে স্বর্গে চলে গেল।

সেখানে গিয়ে তারা ফুলপরীকে প্রণাম করে জোড়হাতে বলল, 'মা! তুমি চলে এলে, তাই আর আমাদের দেশে ফুল ফোটে না। তাতে আমাদের দিন বড় দুঃখে যায়!'

শুনে ফুলপরীর চোখে জল এল।

সে বলল, 'আহা! বাছা, তোদের আর দুঃখ করতে হবে না। এই ঝাখ্ আমাদের দেশে কত ফুল, তোদের যত ইচ্ছা নিয়ে যা, এখন থেকে তোদের ফুলের দুঃখ দূর হয়ে যাবে।'।

ছয়জন বুড়ো মানুষ তা শুনে বার-বার ফুলপরীর পায়ের ধুলো নিল। তারপর তারা যত বয়ে আনতে পারে, তত ফুল নিয়ে দেশে ফিরে এল।

তারপর থেকে সে দেশের গাছে গাছে ফুল ফুটতে লাগল, পাহাড়, বন, মাঠ সব ফুলে ছেয়ে গেল, আর লোকের ফুলের দুঃখ রইল না।



ভালা আর বুয়া



এক চাষার দুটি ছেলে ছিল ; একটির নাম ভালা, আর একটির নাম বুয়া ।

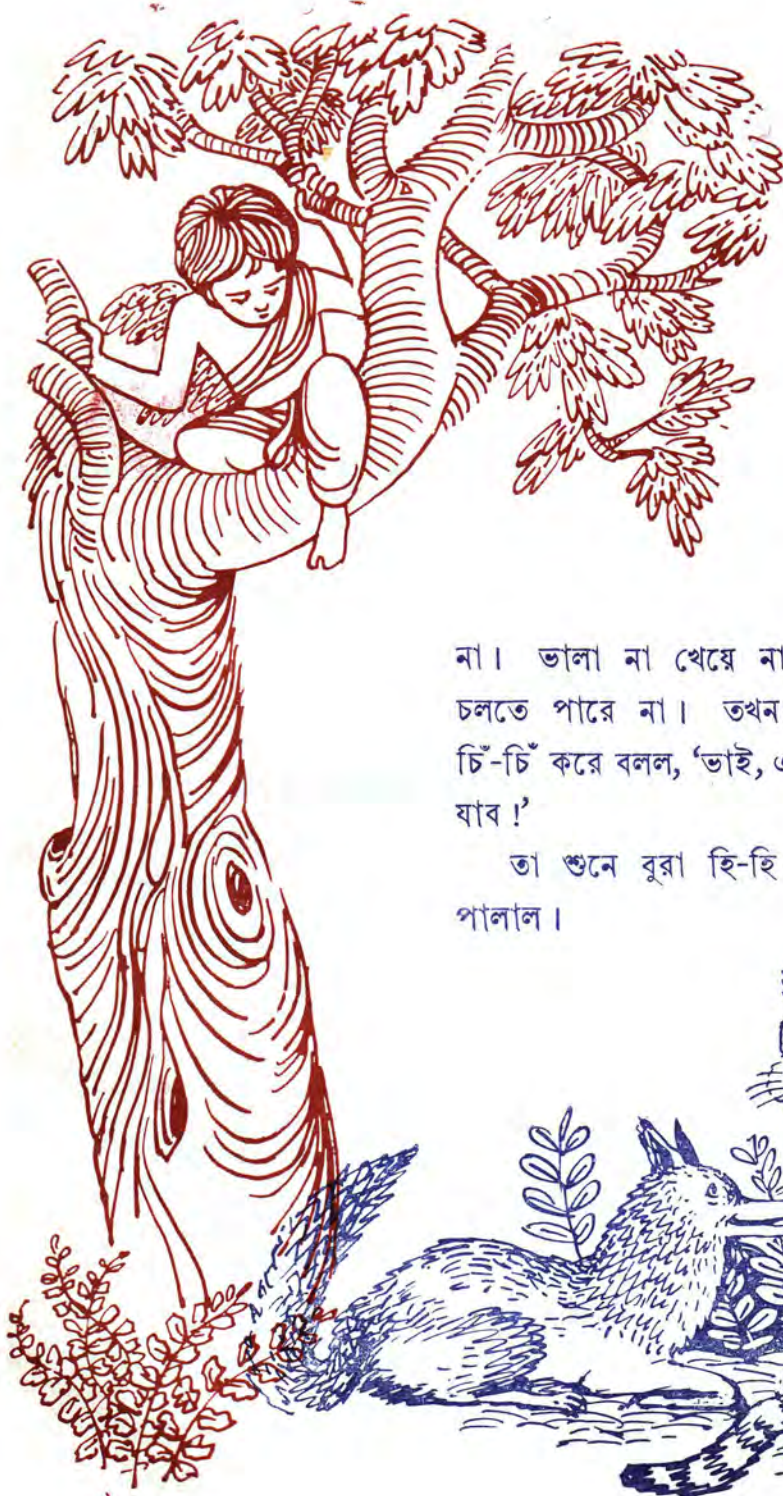
ভালা বড় লক্ষ্মী ছেলে ছিল । সে সব সময়েই হাসত আর মিষ্টি করে কথা বলত । আর, কারো দুঃখ দেখলে সে কেঁদে ফেলত ।

আর বুয়া ছিল ভারি দুফু । সে দিনরাত খালি মুখ ভার করে থাকত, আর কথা বলতে গেলে খঁকিয়ে আসত । অন্য ছেলের হাতে মিঠাই দেখলে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে মিঠাই নিয়ে পালাত ।

ভালা আর বুয়ার বাপ মা যখন মরে গেল, তখন ঘরের সব জিনিস ভাগ করে তারা একজনে একখানি করে কাপড়, একটি করে লোটা আর এক সের করে চাল ছাড়া আর কিছু পেলেনা । তাই নিয়ে তারা দু-জন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল, ভাবল শহরে গিয়ে চাকরি করে খাবে । শহর ছিল অনেক দূরে, সেখানে যেতে পাঁচ ছয় দিন লাগে । বাড়ি থেকে খানিক এসেই বুয়া বলল, ‘দাদা, আগে চল তোমার চাল রেখে দু-জনে খাই । তোমার চাল ফুরিয়ে গেলে আমার চাল খাব ।’

ভালা বলল, ‘বেশ কথা ।’

এই বলে, ভালার চাল রেখে তারা দু-জনে মিলে দু-বেলা করে খেল । তারপর যখন ভালার চাল ফুরিয়ে গেল, তখন সে বুয়াকে বলল, ‘ভাই, এখন তবে তোমার চাল রাঁধ, দু-জনে খাব ।’



তাতে বুঁদ বলাল, 'আমি
তো শুধু আমার চাল খাব
বলেছি, দু-জনে মিলে খাব
এমন কথা তো বলিনি!
তোমার চাল ফুরিয়ে গেছে
তার আমি কী করব?'

ভালা বেচারী আর কী
বলবে? সে চুপ করে রইল।

তারপর থেকে বুঁদ তার
নিজের চাল রেঁধে নিজেই
খায়, ভালাকে কিছুই দেয়

না। ভালা না খেয়ে না খেয়ে এমনি হয়ে গেল যে আর
চলতে পারে না। তখন সে একটা গাছের তলায় পড়ে
চিঁ-চিঁ করে বলল, 'ভাই, একটু খেতে দে, নইলে আমি মরে
যাব!'

তা শুনে বুঁদ হি-হি করে হেসে সেখান থেকে ছুটে
পালাল।



তখন রাত হয়েছে, চারদিকে বনের ভিতরে বাঘ ভাল্লুক ডাকতে লেগেছে।

ভালা ভাবল, ‘এখানে পড়ে থাকলে তো বাঘেই খেয়ে ফেলবে, দেখি একটা গাছে উঠতে পারি কি না!’

এই বলে সে অনেক কষ্টে একটা গাছে উঠে বসে রইল।

ভালাও সব গাছে উঠে বসেছে, আর অমনি একটা বাঘ আর একটা শেয়ালও সেই গাছের তলায় এসে দেখা দিয়েছে।

বাঘটা শেয়ালটাকে বলছে, ‘দেখ, এই যে গাছ দেখছ, এ কিন্তু যে-সে গাছ নয়! এর ছুটি পাতা খেলে আর সাত রাত সাত দিন খাবার দরকার হয় না।’

তা শুনে শেয়াল বলল, ‘তুমি বুঝি খালি এর পাতার কথাই জান, এর ছালের কথা জান না? যে অন্ধ, সে যদি এই গাছের ছালের রস একটু তার চোখে মাখে, তাহলে তখনই তার চোখ ভাল হয়ে যাবে।’

ভালা তো গাছে বসে সবই শুনেছে।

সে ভাবল, ‘বাঃ! বেশ তো বলছে! সত্যি নাকি? আচ্ছা, দেখি!’ বলে সে তখন ছুটো পাতা ছিঁড়ে মুখে পুরে দিল। দিতেই তার ক্ষিধে-টিধে কোথায় চলে গেল, আর তার মনে হতে লাগল যেন সে হালুয়া-পুরি, জিলিপি-লাডু কতই পেট ভরে খেয়েছে, আর তার গায় যেন কতই জোর হয়েছে!

তারপর সকাল বেলায় যখন সে গাছ থেকে নেমে চলে যাবে তখন তার মনে হল যে, এমন জিনিস কিছুটা সঙ্গ করে না নিয়ে গেলেই নয়!

তার কাপড়ে যত ধরে, তত পাতা আর ছাল সেই গাছ থেকে নিয়ে সে গান গাইতে গাইতে আবার পথ চলতে লাগল।

এমনি করে তো সে শহরে এসে উপস্থিত হল। শহরে এসে সে শুনতে পেল যে রাজার মেয়ের চোখে ভয়ানক অস্থখ হয়েছে। কত বগি কত রকম ঔষধ দিয়েছে, কেউ তাঁকে ভাল করতে পারেনি। শেষে রাজা বলেছেন, যে তাঁর মেয়ের চোখ ভাল করে দেবে, তার সঙ্গে তিনি সেই মেয়ের বিয়ে দেবেন।

ভালা ভাবল, ‘এর ঔষধ তো আমার কাছেই আছে!’

যেই এই কথা ভাবা, অমনি সে এক ছুটে রাজবাড়ির দরজায় গিয়ে হাজির হয়েছে। দারোয়ানেরা তাকে দেখে বলল, ‘কী চাও?’

সে বলল, ‘আমি চোখের ঔষুধ জানি। রাজার মেয়েকে ভাল করতে এসেছি।’

দারোয়ানেরা শুনে তো হেসেই অস্থির। বলল, ‘এত এত বড়ি হেরে গেল, আর তুই রাজার মেয়েকে ভাল করে দিবি? হাঃ হাঃ হাঃ! পালা বেটা এখান থেকে!’

ওদের মধ্যে একজন খালি বলল, ‘যদি ওর কোন ঔষুধ জানা থাকে, একবার রাজার কাছে নিয়ে গিয়েই দেখ না!’

তখন তারা সকলে মিলে ভালাকে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা ভালাকে দেখে বললেন, ‘তুমি কী চাও বাপু? কী করতে এসেছ?’

ভালা হাতজোড় করে বলল, ‘আমি চোখের ঔষুধ জানি। আপনার মেয়েকে ভাল করতে এসেছি।’

তা শুনে রাজা বললেন, ‘বটে! আচ্ছা বেশ, যদি আমার মেয়েকে ভাল করতে পার, তাহলে তার সঙ্গে তোমার বিয়ে

দেব। আর যদি না পার, তাহলে কিন্তু তোমার মাথাটি কেটে ফেলব!’

তখন ভালাকে রাজার মেয়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। ভালা যেই সেই গাছের ছালের একটু রস নিয়ে রাজার মেয়ের চোখে মাখিয়ে দিয়েছে, অমনি তিনি চোখ মেলে





চেয়েছেন। তা দেখে রাজা-মশাই কী খুশী যে হলেন, আর কত রকম করে যে ভালার পিঠ চাপড়ালেন আর তার মাথায় হাত বোলালেন, তা কী বলব!

তারপর রাজা ভালাকে বকবকে পোশাক পরিয়ে, বর সাজিয়ে রাজকন্য়ার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে নিজের অর্ধেক রাজ্য তাকে দিয়ে দিলেন। কী ধুমধামটাই হল! আর হালুয়া-পুরির তো কথাই নাই! পাতে বা পড়ে রইল, তা খেতে হাজার ভিখারী জুটে গেল। সেই ভিখারীদের দলের একটা ছোকরাকে দেখে ভালা বলল, 'তাই তো! এ যে আমারই ভাই বুড়া! ওকে খুব ভাল করে খাইয়ে তারপর আমার কাছে নিয়ে এস তো!'

বুড়াকে নিয়ে এলে ভালা তাকে বলল, 'ভাই, আমাকে চিনতে পারছ না? আমি যে তোমার দাদা ভালা!'

বুড়া অনেকক্ষণ ধরে হাঁ করে দাদার মুখের দিকে



তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, ‘ওমা ! তাই তো !
দাদা যে ! তুমি কী করে এমনি হলো ?’

ভালা বলল, ‘তুমি তো আমাকে গাছতলায়
ফেলে এসেছিলে, ভেবেছিলে আমি মরে যাব।
আমি কিন্তু মরিনি। আমি সেই গাছে উঠে
বসে রইলাম, আর সেখানে ভারি আশ্চর্য ছোটো
জিনিস পেলাম ; তাতেই আমাকে এমনি করে
দিয়েছে।’

একথা শুনে বুঝা
ভাবল, ‘আমিও গিয়ে
সেই গাছে উঠে বসে
থাকব, আর সেই আশ্চর্য
জিনিস এনে বড়লোক
হয়ে যাব।’ এই ভেবে
বুঝা তো সেই গাছে উঠে



গিয়ে বসে আছে, সে জানে না সেখানে কী আশ্চর্য জিনিস
পাওয়া যাবে। রাত্রে সেই বাঘ আর শেয়াল এসে যখন সেই
গাছের তলায় বসল, তখন তাদের দেখে বুঝা ভয়ে আর কিছুতেই
ডাল ধরে বসে থাকতে পারল না। সে কাঁপতে কাঁপতে
শেষে টিপ্ করে পড়েই গেল, আর অমনি বাঘ আর শেয়াল
দু-জনে মিলে তাকে খেয়ে ফেলল।



তারপর

এক যে রাজা, তাঁর ভারি গল্প শোনার শখ। কিন্তু তা থাকলে কি হয়, রাজামশাইকে কেউ গল্প শুনিয়ে খুশি করতে পারে না।

রাজামশাই বলেন, ‘যে আমাকে গল্প শুনিয়ে খুশি করতে পারবে, তাকে আমার অর্ধেক রাজ্য দেব, না পারলে কান কেটে নেব।’

তা শুনে দেশ-বিদেশের কত ভারি ভারি নামজাদা গল্পওয়ালারা কোমর বেঁধে, গোঁফে তা দিয়ে গল্পের ঝুড়ি নিয়ে আসে, কিন্তু কেউ রাজামশাইকে খুশি করতে পারে না। যাবার সময় সকলেই কাটা কান নিয়ে দেশে যায়।

গল্প বলতে গেলেই রাজামশাই খালি বলেন, ‘তারপর?’ ‘তারপর’ ‘তারপর’ করে গল্পওয়ালার কথা শেষ করে তবে তিনি ছাড়েন। ‘রাফস মরে গেলো’—‘তারপর?’ ‘রাজপুত্র বেঁচে গেলেন’—‘তারপর?’ ‘বৌ নিয়ে দেশে এলেন’—‘তারপর?’ ‘ভারী আনন্দ হলো’—‘তারপর?’ ‘আমার কথাটি ফুরাল।’—‘তারপর?’ ‘নটে গাছটি মুড়াল।’—‘তারপর?’ এমনি করে আর কত বলবে? কাজেই শেষে একবার তাকে বলতে হয় ‘আর আমি জানি না’ বা ‘আর বলতে পারছি না।’ তাহলেই রাজামশাই বলেন, ‘তবে গল্প বলতে এসেছিলে কেন? কাট তবে ব্যাটার কান।’

এই তো ব্যাপার। রাজামশাইয়ের তারপরের শেষও কেউ করে উঠতে পারে না। অর্ধেক রাজ্যও পায় না, লাভের মধ্যে কানটি যায়।

সেই দেশে থাকে এক নাপিত, সে বড় কুড়ে, কিন্তু ভারি সেয়ানা। সে ভাবলে অর্ধেক রাজ্য যদি পাই, তবে নেহাৎ মন্দ হবে না। একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? না হয় কানটাই যাবে।

এই ভেবে সে জামা-কাপড় পরে, মস্ত পাগড়ি বেঁধে, লম্বা ফাঁটা কেটে, রাজার সভায় গিয়ে লম্বা সেলাম ঠুকে জোড়াহাতে বলল, ‘মহারাজের জয় হোক! হুকুম হয় ত কিছু গল্প শোনাই।’

রাজা বললেন, 'ভাল, ভাল। কিন্তু শর্ত জান ত, খুশি করতে পারলে, অর্ধেক রাজ্য দেব, নইলে কানটি কেটে নেব।'

নাপিত বলল, 'আমার গল্পের আগাগোড়া শুনতে হবে, মাঝখানে থামতে বলতে পারবেন না কিন্তু।'

রাজা বললেন, 'তাই সই। আমিও ত তাই চাই।'

তখন নাপিত চাকর-মহলে গিয়ে আচ্ছা করে ছিলিম আট দশ তামাক টেনে এসে খুব গম্ভীর হয়ে বলতে লাগল :

—'মহারাজ, এখান থেকে অনেক দূরে এক আজব দেশ ছিল।' অমনি মহারাজ বললেন, 'তারপর?'

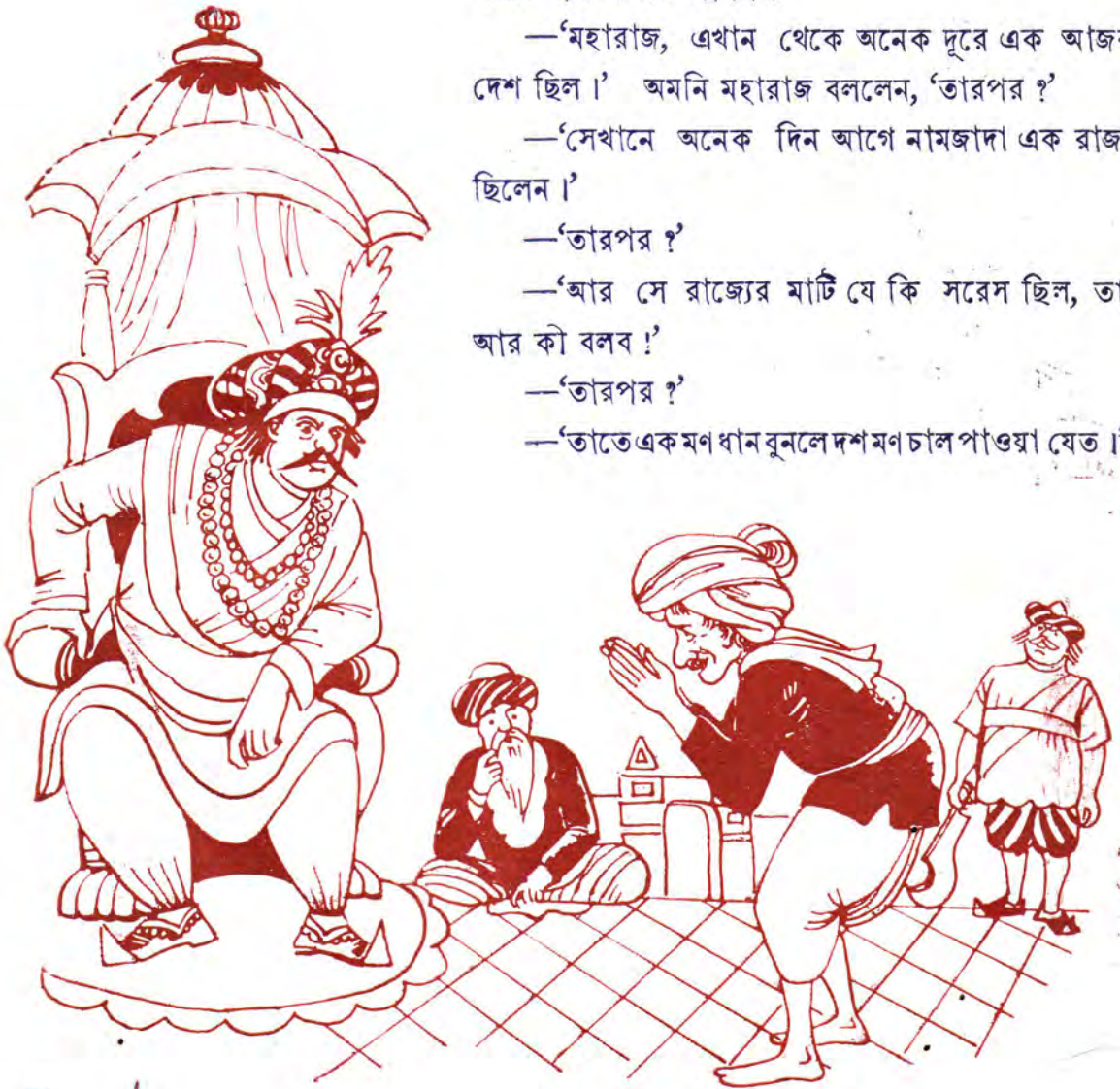
—'সেখানে অনেক দিন আগে নামজাদা এক রাজা ছিলেন।'

—'তারপর?'

—'আর সে রাজ্যের মাটি যে কি সরেস ছিল, তা আর কী বলব!'

—'তারপর?'

—'তাতে এক মণ ধান বুনলে দশ মণ চাল পাওয়া যেত।'



—‘তারপর?’

—‘তাই দেখে রাজামশাই তাঁর রাজ্যের সমস্ত জমিতে ধানের চাষ করালেন।’

—‘তারপর?’

—‘আর তাতে ধান যা হল! সে ধান রাখবার জন্যে যে গোলা তয়ের হয়েছিল, তার একধারে দাঁড়ালে আরেক ধার দেখা যেত না।’

—‘তারপর?’

—‘লাখে লাখে মোষের গাড়ি লেগেছিল সে ধান গোলায় আনতে। এত বড় গোলা, তাও একেবারে বোঝাই হয়ে গিয়েছিল, আর একটু হলেই ফেটে যেত।’

—‘তারপর?’

—‘তারপর সেই ধানের খবর পেয়ে পঙ্গপাল যা এল! পঙ্গপালে পঙ্গপালে দশ দিক ছেয়ে গেল, আকাশ অন্ধকার, হাওয়া চলবার যো নেই, শ্বাস টানলে ঝাঁকে ঝাঁকে পঙ্গপাল নাকে এসে ঢোকে।’

—‘তারপর? তারপর?’

—‘ব্যাটারা এসেছে ধান খেতে। কিন্তু রাজামশাইয়ের গোলা কি যেমন-তেমন করে গড়া? পঙ্গপালের সাখি কি তাতে ঢুকবে? দশ দিন ব্যাটারা বন্ বন্ করে গোলার চারধারে ঘুরে বেড়াল, কিন্তু গোলার কোনখানে একটা বিঁধ বার করতে পারল না।’

—‘তারপর? তারপর?’

—‘তারপর এগার দিনের দিন কয়েকটা ডানপিটে আর একরোখা ছোকরা পঙ্গপাল খুঁজে খুঁজে কোথেকে গিয়ে একটা বিঁধ বার করেছে, অনেক ঠেলাঠেলি করলে তা দিয়ে ভেতরে ঢোকা যায়।’

—‘তারপর? তারপর?’

—‘তখন তাদের পালের গোদাটা এসে বলল, ঠ্যাল্ ত রে বাপু সকলে তোরা সবাই মিলে, দেখি ভেতরে ঢুকতে পারি কিনা।’

—‘তারপর?’

—‘তারপর—ওঃ! সে কী বিষম ঠেলাঠেলি! গোদা ব্যাটা চ্যাপ্টা হয়ে গেল—তবু বলল, ঠ্যাল্...ঠ্যাল্...’

—‘তারপর?’

—‘শেষে অনেক কষ্টে অর্ধেক ছাল বাইরে রেখে তবে গিয়ে গোদা’ ব্যাটা ভেতরে ঢুকল।’

—‘তারপর?’

—‘টুকে একটি ধান মুখে করে নিয়ে, বিঁধের কাছে এসে বলল, এবারে আমাকে টেনে বার কর।’

—‘তারপর?’

—‘ওঃ! সে কী টানাটানি! আরেকটু হলেই ব্যাটা ছিঁড়ে ছু’-আধখানা হয়ে যেত! যা হোক, অনেক কষ্টে সে ধানটি নিয়ে বাইরে এল।’

—‘তারপর?’

—‘তারপর আরেক ব্যাটা গিয়ে বসেছে সেই বিঁধের মুখে। আবার তেমনি ঠেলাঠেলির পর



ভেতরে ঢুকেছে অনেক কষ্টে, তারপর একটি ধান নিয়ে তেমনি টানাটানির পর বাইরে এসেছে বেরিয়ে।’

—‘তারপর?’

—‘তারপর আর এক ব্যাটা গিয়ে ঢুকেছে, আর একটা ধান নিয়ে বাইরে এসেছে।’

—‘তারপর?’

—‘তারপর আর এক ব্যাটা—’

—‘তারপর?’

—‘আরেক ব্যাটা—’

—‘তারপর?’

—‘আরেক ব্যাটা—’

—‘তারপর?’



—‘আরেক ব্যাটা—’

রাজামশাই যতই জিগ্যেস করেন, ‘তারপর?’

নাপিত ততই খালি বলে—‘আর এক ব্যাটা।’


দণ্ডের পর দণ্ড এমনি ভাবেই গেল। রাজামশাই ব্যস্ত হয়ে উঠছেন, কিন্তু না শুনে উপায় নেই। বলেছেন আগাগোড়া শুনবেন, খামিয়ে দিতে পারবেন না। সন্ধ্যের সময় রাজামশাই আর থাকতে না পেরে বললেন, ‘আরে, আর কত বলবে? এখনো কি—শেষ হল না?’

নাপিত জোড়হাতে বলল, ‘সেকি মহারাজ! সবে তো আরম্ভ। গুটি-কয়েক পঙ্গপাল সবে গুটি-কতক ধান নিয়েছে। এখন গোলা ধানে বোঝাই। ওদিকে আকাশ পঙ্গপালে অন্ধকার—’



কাজেই আর কি করা যায়? রাজামশাই আরো দু’দিন ধরে পঙ্গপালের কথা শুনলেন। তারপর কিছুতেই আর থাকতে না পেরে, কঁাদ-কঁাদ স্বরে বললেন, ‘গল্প শোনা আমার চের হয়েছে বাবা! অর্ধেক রাজ্য নাও, নিয়ে আমায় ছেড়ে দাও। আমি একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।’

তখন নাপিতের খুব মজাই হল!



অথৈ জলের
রাজপুরী শুধু জলের
ভেতরের রাজপুরী নয়, যেন
মণি-মাণিক্যের জ্যোতি ঠিকরোনো
অপরূপ রূপকথার গল্পের রাজপুরীও। কোন্
যাত্রার কাঠির পরশ পেয়ে বুঝি খুলে গেছে সে রাজপুরীর
সিং-দরজা। আর তারপরই একে একে বেরিয়ে এসেছে কবি
চ্যাঙ, পাকা ফলার খেতে চাওয়া বাগুন, অতি চালাক
পিটার আর মজাদার সাত ভাই, ফুলপরী, ভাল-বুরা।
আর সব শেষে সেই গল্প-শোনা রাজা আর
হুঁফু নাপিত—যার গল্প
কোনদিনই শেষ
হবে না।